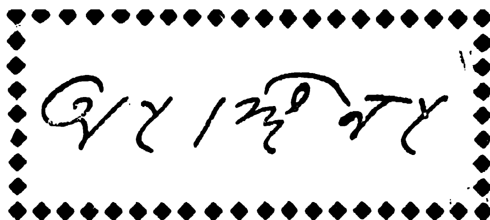
Vol. V.



(মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ)



বান্ধব-দাসানুদাস

মহানামব্রত

সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায় সেবক

গোপীবন্ধুদাস

কর্ত্তৃক—

ফরিদপুর,

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন হইতে প্রকাশিত।

বৈশাখ, ১৩৩৮

জন্ম-রহস্য।

যেমন জননীর কোলে কন্যা,
তেমন ভারত মাতার অঙ্ক উজলি'
বঙ্গ দুহিতা ধন্যা।
যেমন সিঁন্দুরে সুন্দরী সাজে,
তেমন বাংলার সীমন্তে রাজধানী অই
মুর্শীদাবাদ রাজে।
যেমন বরজে তপন মালা,
তেমন মুর্শীদাবাদের হিয়ামাঝে রাজে
গঙ্গার তরঙ্গ বালা।
যেমন কাশীনাথ গৌরী-সাথ,
তেমন জাহ্নবীর তীরে ডাহাপাড়া ধামে
বামাদেবী দীননাথ।
যেমন চাঁদিমা তপন কোর,
তেমন দীন-দিননাথ বামা-চন্দ্রাননা
প্রেম রসাম্বুধে ভোর।
যেমন বাছুরী বিহনে ধেনু,
তেমন যশোদা-আবেশে কাঁদে বামাদেবী
কোথা নীলমণি কানু।
যেমন বাঘিনী ডম্বুর-হারা,
তেমন ঘন ফুকারিছে 'নিমু নিমু' ব'লে
মিশ্রঘরণী পারা।
যেমন গঙ্গায় যমুনা মিলে,
তেমন বামাদেবী-হৃদি প্রয়াগ-সঙ্গমে
দু'হুভাব এককালে।
যেমন নিশি শেষে আলো হয়,
তেমন বিচ্ছেদের পর মিলন আসিয়া
লীলা করে মধুময়।

শ্রীবন্ধু নবমী আজ,
আজি, গোলোক ছাড়িয়া অতুল রতন
নামিবে ধূলার মাঝ।
যেমন বীজেতে লুকায় গাছ,
তেমন পাপ-পীড়িতা বসুমতী সতী
ধরিল গাভীর সাজ।
যেমন বিরহে বঙ্গের বধু,
তেমন চারিশত বর্ষ মলিনা কুহু-জা
হারায়ে গৌরাঙ্গ বিধু।
যেমন ভাদরে বাদর ঝরে,
তেমন চক্ষে ধারা ধরা ঝুরিল গঙ্গার
তপত বুকের পরে।
যেমন সন্তাপে নবনী গলে,
তেমন পঞ্চে পঞ্চতত্ত্ব-সুধাময়-বপু
গঙ্গার উদরে ঢলে।
যেমন মঙ্গল মহোৎসবে,
তেমন শ্রীমাহেন্দ্রক্ষণ পুষ্পবন্ত যোগ
একত্র মিলিল সবে।
যেমন পাণ্ডবেরা স্বর্গপথে
তেমন গ্রহপঞ্চক তুঙ্গে চড়িয়া
নাচিছে বিমান রথে।
যেমন বাসরে নবোঢ়া রাজে,
তেমন দিবস-যামিনী মিলন মধুর
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত মাঝে।
যেমন মণি শিরে সাজে ফণী,
তেমন রাঙ্গিয়া ললাট হিঙ্গুল রাগে
সাজে দিগ্‌বধূ ধনী।

(ইহার পর কভারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)





আঙ্গিনা।



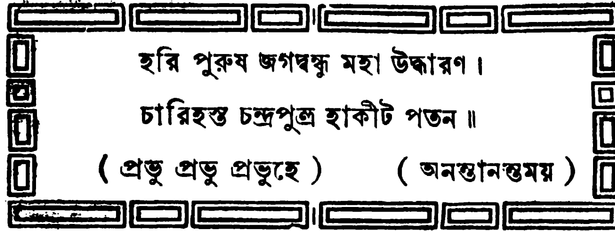
দ্বিতীয় বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ

"শুভ আবির্ভাব"

শ্রীশ্রীবন্ধু-নবমী হইতে ফুল-দোল পর্য্যন্ত

ছাপান্ন প্রহরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসব

'শ্রীশ্রীসীতানবমী'
শ্রীহরিপুরুষাব্দ—৬১
১৩৩৮



হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ।
চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হাকীট পতন॥
(প্রভু প্রভু প্রভুহে) (অনন্তানন্তময়)

বন্ধুলীলা-সুধানিধিঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

অতঃ সমাধানগুণেন সর্ব্বং
কর্ম্মাভিভূয় স্থিরভক্তিবিম্বম্।
উদ্দিশ্য লোকোপকৃতিং বিতেনে
কৃষ্ণস্য সংকীর্ত্তনমেব নাম্নঃ ॥ ১৬ ॥

স দুঃখিরামাভিধ ভক্তবর্য্যং
তদার্জ্জবাবর্জিত কান্তচিত্তঃ।
বিখ্যাচিতং ষড়্ভুজমাত্মনোঽগ্র্যং
প্রাদর্শয়দ্রূপমশেষরূপঃ ॥ ১৭ ॥

ভক্তেষু চান্যেষপি পাবনো বিভু
বিভূতি মুচ্চৈঃ কিল সূচয়ন্নিজাম্।
আবিরভূবাব্যয় ভাব বোধকঃ
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণযুগাকৃতিং দধৎ ॥ ১৮ ॥

প্রভাব মত্তার্হিত মাত্মবন্ধো-
রপূর্ব্ব মত্যাতত মপ্যবেত্য।
পরীক্ষিতুং তং বিষদানতোঽন্যঃ
কশ্চিজ্জড়াত্মা যততে স্ম চিত্রম! ১৯ ॥

যন্নাম সংসার-মহাবিষং ক্ষণা-
ন্নিহন্তি ভক্ত্যা সমুদীরিতং সকৃৎ।
তত্র প্রযুক্তং বিষমর্ভকং কুতো-
হমৃতায়মানং বিলয়ং ন যায়াৎ? ২০

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাম স্বামী।

মহানামের চন্দন বৃষ্টি।

ঐ শোন! বান্ধব কণ্ঠে মৃদঙ্গ যন্ত্রে,
কেমন উঠ্‌লো মধুর তান।
প্রলয় রাত্রি প্রভাত হ'লো,
স্বস্তি মহানাম গান॥
নূতন সৃষ্টির চমিয় ফোঁটা,
ফুট্‌লো স্বভাব সতীর ভালে।
সীতা সাবিত্রী রামকৃষ্ণ মৈত্রী,
দুল্‌লো কীর্ত্তন দোলে॥
কোলাকুলি ঢলাঢলি,
মধুর ধীর সমীরের খেলা।
শিশুভাব প্রতিষ্ঠা হ'লো,
মিঠে খোকন চুষীর খেলা॥
নাহি অজ্ঞান কি জ্ঞান বিজ্ঞান,
তর্কশাস্ত্রের কচকচি।
কামিনী কাঞ্চনের শব্দ ভেদীবান
কুহক মায়া মরিচী॥
অহিংসা নিষ্কণ্টক ভেল,
বন্ধু কথায় রুচি হ'লো।
মহাপাপ হরিহিংসা ল'য়ে,
কেবল মতিচ্ছন্ন দূরে র'লো॥

—মহানাম ভিক্ষু মহীন।

কৃপার ধারা।

হাওড়া ষ্টেশন। অবিরাম গাড়ীর যাতায়াতে ও অগণিত নরনারীর কোলাহলে ষ্টেশনখানি মুখরিত। চির স্বতন্ত্র ভক্তপ্রিয় প্রভু বন্ধু আজ কি জানি কোন কারণে স্বীয় পূর্ব্ব লীলাস্থলী শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন ইচ্ছা করিয়া ঐ ষ্টেশনে আসিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বিশ্রাম প্রকোষ্ঠ চম্পটীমহাশয়ের দ্বারা গঙ্গাজল দ্বারা ধোয়াইয়া লইয়া নীরবে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। চম্পটীমহাশয় দিবাকরকে লইয়া দরজায় বসিয়া পাহারা দিতেছেন। দিবাকর একটি অল্প বয়স্ক যুবক। শ্রীল চম্পটী ঠাকুরের আনুগত্যে সতত শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুর পদারবিন্দ সেবনে তন্ময় থাকেন। রাত্রি ১০টার ট্রেনে প্রভু রওনা হইবেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় হইতেই ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বন্ধু আমার একটী গদীর উপর একখানি নির্ম্মল বস্ত্র বিছাইয়া শিরীষ-কুসুমনিভ অঙ্গখানি বিন্যাস করতঃ অর্দ্ধশায়ীত অবস্থায় নিমীলিত নয়নে নিবিষ্ট মনে রহিয়াছেন। বাম চরণের উপর দক্ষিণ চরণখানি রক্ষা করতঃ ঈষৎ দোলাইতেছেন। কে জানে কোন্ জগতের মঙ্গল চিন্তায় জগৎসুন্দর এমনি ভাবে আপনা ভোলা।

চম্পটীঠাকুর দরজা ঠেলনা দিয়া একখানি খবরের কাগজ হাতে লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। হঠাৎ প্রভুর বীণাবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠ তাহার কাণে পৌছিল।

প্রভু ডাকিলেন—"অতুল"

'প্রভু'! বলিয়া ত্রস্তভাবে দরজা খুলিয়া চম্পটীঠাকুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রভু বলিলেন—অতুল, টিকেট করিয়া আন। চম্পটী মহাশয় বলিলেন—'টাকা'। 'আমি জানিনা' বলিয়া প্রভু অন্যদিকে তাকাইলেন।

চম্পটীঠাকুর জানিতেন যে প্রভু কদাপি অর্থাদি স্পর্শ করেন না। কিন্তু আজ যেন তাহার কেমন একটা ভুল হইয়া গিয়াছিল—টিকেটের কথা তাহার এতক্ষণ মনেই হয় নাই। প্রভুর কথা শুনিয়া চম্পটী মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন ও উর্দ্ধশ্বাসে সহরাভিমুখে ছুটিলেন। প্রভুর যখন কোনরূপ অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহা অনেক সময় চম্পটী মহাশয়ের দ্বারাই সংগ্রহ করাইতেন। প্রভুর প্রত্যেকটি কার্য্যের মধ্যেই নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত থাকিত। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ দেব যেমন অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের উপর গৌড় দেশে হরিনাম প্রচারণের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন—প্রভু বন্ধুও তেমনি বিশাল কর্ম্মভূমি কলিকাতা মহানগরীকে মধুর হরিনামে মুখরিত করিবার জন্য চম্পটী ঠাকুরের উপর ভিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। আর এ পাত্র ঐ কার্য্যের উপযুক্তও ছিল বটে। চম্পটী মহাশয় যখন শ্রীকরতালে বাজাইয়া "হরিবোল" বলিয়া গগন ভবন মুখরিত করিয়া সহরময় বেড়াইতেন তখন অতি বড় পাষাণ প্রাণও গলিয়া জল হইয়া যাইত। প্রভুর সেবার জন্য কাহারও নিকট কিছু চাহিয়া প্রায়ই বিফল মনোরথ হইতেন না। তাহার বুদ্ধির স্থিরতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা এতই অধিক ছিল যে নিঃসঙ্কোচে প্রায় সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন।

কিন্তু আজ তাঁহার বুদ্ধি-বিচার সবই যেন লোপ পাইয়াছে। হাওড়ার পুল পার হইয়াই তিনি ভাবিলেন, কোথায় যাই? রাত্রি ৯টা বাজিল। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রভুকে টিকেট করিয়া দিতেই হইবে। এত রাত্রে কে টাকা দিবে। চম্পটী মহাশয় ফিরিলেন। উর্দ্ধমুখে দৌড়িয়া আবার প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন। 'প্রভু! এত রাত্রে টাকা কোথায় পাব?' চম্পটী মহাশয়ের মনের ভাব এই যে প্রভু যদি একবার বলিয়া দেন, কাহার কাছে গেলে টাকা মিলিবে তবে নিশ্চন্ত মনে সেখানেই যাইতে পারেন। মুচকি হাসিয়া রঙ্গলাল বলিলেন—'কোনও গৌর ভক্তের নিকট হইতে লইয়া এস।' দিবাকরকে প্রভুর দরজায় পাহাড়া রাখিয়া চম্পটী মহাশয় পুনরায় উর্দ্ধশ্বাসে কোন গৌর ভক্তের সন্ধানে কলিকাতা সহরাভিমুখে ছুটিলেন। কোথায় যাবেন কিছুই ঠিক নাই। বরাবর চিৎপুর পর্য্যন্ত আসিয়া যেন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই যন্ত্র চালিত পুতুলের মত বাঁদিকে বাঁকিলেন। বিডন স্কোয়ারের নিকটে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে একটী শিখা মালাধারী নধর কান্তি যুবককে দেখিয়া চম্পটী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি গৌরভক্ত?' দোকানী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। চম্পটী মহাশয় পুনরায় বলিলেন 'ভাবিতেছেন কি, মহাশয়, সরল ভাবে সত্য কথায় উত্তর দেন।' দোকানী অতি দীনভাবে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন 'আজ্ঞা, অধমের ঐরূপ একটি অপবাদ আছে।' চম্পটী মহাশয় তখন বলিলেন, 'আমার প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর। তিনি রাত্র ১০টার গাড়ীতে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবেন। গাড়ী ভাড়ার টাকার প্রয়োজন। তিনি কোন গৌর ভক্তের নিকট হইতে ঐ টাকা নিতে বলিয়াছেন। আপনি যখন গৌরভক্ত, তখন আপনাকেই ঐ টাকা দিতে হইবে।' দোকানী জিজ্ঞাসা করিল—"কত টাকা"? চম্পটী মহাশয় বলিলেন—২৫৷৵১০। দোকানী বলিল—'অত টাকাতো হইবে না।' চম্পটী মহাশয় বলিলেন, 'আপনার বাক্সে যে টাকা আছে তাহা ঢালুন ও গণিয়া দেখুন, যদি ঐ টাকা হয় তবে দিবেন, নচেৎ আর আপনি কোথা হইতে দেবেন।' দোকানী তখন বাক্সের টাকা গদীতে ঢালিয়া গণিতে আরম্ভ করিল। কি আশ্চর্য্য—ঠিক ২৫৷৵১০ই হইল। এক পয়সা বেশীও নয় কমও নয়। দোকানীর চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। ভক্তি গদ গদ স্বরে প্রভুর অন্তর্য্যামিত্বের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে অম্লান বদনে ঐ টাকা চম্পটী মহাশয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন। চম্পটী মহাশয়ও

'হরি হরি বোল' বলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি দিতে দিতে ঠিক যেন বিদ্যুদ্বেগে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট করিয়া প্রভুকে ট্রেনে তুলিয়া দিলেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়া বিদায় লইলেন। ট্রেন ছাড়িয়া গেলে চম্পটী মহাশয় দিবাকরের সঙ্গে বন্ধু গুণগান করিতে করিতে সহরে ফিরিলেন। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া "হরি হরি বোল" "জয় মুকুন্দ ঘোষ" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিতেই দোকানী মুকুন্দ ঘোষ দরজা খুলিয়া সজলনেত্রে তাকাইয়া দেখিলেন—হরি বোলা ঠাকুর চলিয়া যাইতেছেন।

ঐ দিন হইতে তিনি শ্রীশ্রীবন্ধু হরির কৃপালাভ করিয়া অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জ্ঞানে ঐ চরণে আত্মসমর্পণ করতঃ চির জীবন ভজনানন্দে ও সাধু বৈষ্ণব সেবা-সুখে অতিবাহিত করিয়াছেন। ঘোষ মহাশয় খ্যাতনামা সুরসিক কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ বিশারদ ছিলেন।

প্রভু আমার অযাচিত কৃপাকারী। তিনি চাহেন জীবের ষোল আনা মনপ্রাণ। মূঢ় জীব সেই মনপ্রাণ বিষয়ের বিষকূপে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভগবান আসিয়া সম্মুখে নাচিয়া গেলেও ফিরিয়া তাকাইবার অবসর পায় না। তাই চতুর চূড়ামণি কখনও কখনও জীবের পরম প্রিয় বস্তু যে টাকা, তাহা গ্রহণ করিয়া ঐ সুযোগে তাহার মনে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাই বুঝি একদিন চম্পটী ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—

"Atul! money is the most sensitive part of human skin."

ধন্য কৃপাকারী। বলিহারী তোমার কৃপার ধারা।

গোপীবন্ধু দাস।

"জয় জগদ্বন্ধু"

শ্রীশ্রীবন্ধুমহামণ্ডল পরিক্রমণ।

নিত্যের গুপ্তলীলা ভূলোকে প্রথম প্রকট শ্রীধাম বৃন্দাবনে। বিশ্ব যখন যোগ-কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির চরম সীমায় পৌঁছিয়া আরও যেন কিছুর আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বৃন্দাবনের মাঝে অতি গোপনে এই প্রেমের খেলাটী চলিয়াছিল। মহাভাবময়ী শ্রীমতীর সঙ্গে কুঞ্জে কুঞ্জে কুণ্ডে কুণ্ডে সেই অপ্রাকৃত মিলন-মাধুরী উপভুক্ত হইয়াছিল। ঐ যে—

"নিধুবনে একাসনে যুগলরতন।
নবীন নীরদ ক্রোড়ে হ্লাদিনী যেমন॥"

মরি মরি! তখন কি মধুর শোভাই না হইয়াছিল! আর—

"চারিদিকে ব্রজবালা, করে মালতীর মালা,
গলায় চিকন মালা করিয়া যতন॥"

ব্রজবালাগণ নবমালতীর মালা রাধাশ্যামের গলায় পরাইয়া আনন্দে ভরপুর হইতেন। এইরূপে যাবটে বংশীবটে কুণ্ডতটে এক অভিনব প্রেম-মাধুরী মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বাদশবন নিকুঞ্জ কানন প্রেমের অলক-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবসৌন্দর্য্যমাখা রাধাকৃষ্ণ সখীপুঞ্জের সঙ্গে যে গোপন-রসের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান লাভ করিবার জন্য তৃষিত ভক্তকুল সতত আপনাহারা। তাই ব্রজলীলা অপ্রকট হইবার পরও ভক্তবৃন্দ বর্ষে বর্ষে সেই লীলাস্থানগুলি পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। সেই স্মৃতি বহন করিয়া কুণ্ডে কুণ্ডে স্নান করেন আর বনে বনে ঘুরিয়া প্রাণদয়িতের নিকুঞ্জ বাসরে ফুলশয্যায় শায়িত যুগলরত্নের অন্বেষণ রত হইয়া থাকেন। প্রভুর অন্তরে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে প্রণাম করেন, কেলীকদম্বকে প্র

কালিন্দী যমুনাকূলে বসিয়া রসরাজের লীলারসসুধা আস্বাদন করেন, শ্রীরাসমণ্ডলের অতুল অমৃতরজে গড়াগড়ি দিয়া কৃতার্থ হন। অষ্টপাশ-মায়াবাদ মোচন লীলা বস্ত্রহরণ ঘাট দর্শন করিয়া কৃষ্ণপতি লাভের জন্য ঘৃণা-লাজ-ভয় বিদূরিত করিবার ইঙ্গিত পান। কোথাও বা হৃদয় লতের পদচিহ্ন, কোথাও বা বাল গোপালের হস্তের ননীর দাগ, কোথাও বা শ্রীদাম সুদামাদি রাখালগণের সঙ্গে গোচারণ খেলা এই সমস্ত লীলাস্মৃতিগুলি প্রেমিক ভক্তকে রসামৃতসিন্ধুর অতল-তলে ডুবাইয়া দেয়। ব্রজলীলাটী নবায়মান হইয়া নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সে যেন অনুভূতির নয়নে স্পষ্ট দেখিতে পায় যমুনার জল কল্‌কল্ তানে আবার উজান পথে ছুটিয়াছে—শ্যামের মোহন বাঁশরী ঐ গোপ-রমণীগণের মরমে পশিয়া তাঁহাদিগকে উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়াছে—ধেনু বৎস পালের সহিত ঐ কৃষ্ণবলরাম রাখাল রাজা সাজিতে বনপথে চলিয়াছেন—যশোদারাণী ঐ ক্ষীর-সর-নবনী লইয়া গোপালের উদ্দেশ্যে পথের পানে তাকাইয়া আছেন। চিন্ময় অপ্রাকৃত ধামে আনন্দময়ের নিত্য লীলা যেন নিত্যই চলিতেছে।

আর একদিন সেই সুচতুর ব্রজনাগর নাগরীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া সখা সঙ্গিনীগণ সহ নূতন সাজে নবদ্বীপের কোলে গড়াইয়া পড়িলেন। মর্ত্ত্যের মাঝে আবার লীলাধাম ফুটিয়া উঠিল। জীবোদ্ধারণের যে বীজ শ্রীবৃন্দাবনের মাঝে অঙ্কুরিত হইয়াছিল আজ তাহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া ত্রিতাপ ক্লান্ত জীবকুলকে শান্তশীতল ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাই কলসীর কাণা খাইয়াও ক্ষমার মূর্ত্ত-বিগ্রহ পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। প্রেমের ডালি বহন করিয়া পতিত জীবের ঘরে ঘরে ঘুরিলেন আর যাচিয়া যাচিয়া দান করিলেন। যুগধর্ম্ম হরিনামই সাধনসার কৃষ্ণ প্রেম লাভের সুলভ পন্থা নির্দ্দেশিত হইল। গৌরাঙ্গসুন্দর মহাভাব সুধা ছানিয়া লইয়া আস্বাদন করিতে করিতে দ্বাদশদশার মোহন মাধুরী লুটিয়াও যেন তৃপ্ত হইলেন না, তাই 'আবার আসিব' বলিয়া অন্ত উদ্ধারণে গমন করিলেন। আজ আমরা গৌর নিত্যানন্দ কৃপাকণালাভে ধন্য হইবার এবং পতিতপাবনের লীলাস্থান সমূহ দর্শন করিয়া প্রাণে আশার বর্ত্তিকা জ্বালাইবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরমণ্ডল পরিক্রমণ করিয়া থাকি। ভক্ত বৈষ্ণব সংকীর্ত্তনানন্দে পরমাবিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরকে অনুভূতিতে আনিয়া অপার্থিবতার আনন্দ হিল্লোলে দুলিতে থাকেন। শচীর ক্রোড়ে নিমাইকে স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে প্রাণকান্তকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। নিত্যানন্দসঙ্গে গৌরচন্দ্রকে জীবের দ্বারে দ্বারে নিজ প্রেমসুধা বিতরণের জন্য কাঙ্গালসাজে উপস্থিত দেখিতে পান। প্রিয় গদাধর সহ শচীনন্দনের চরণরেণু-পূত নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমণ জয়যুক্ত হউক।

ব্রজলীলা গৌরলীলা মহাসম্মিলনরূপী শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দর শ্রীধাম গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনকে তাঁহার মহামহীয়সী লীলার কেন্দ্রস্থল করিয়াছেন। বন্ধুর সে মহামহাভাব সমুদ্র এবার নিস্তরঙ্গ। সর্ব্বধর্ম্মময় প্রভু তাহার কথিত কাঞ্চনজিত ভুবনমোহন শ্রীঅঙ্গখানি ত্রিশ বৎসর যাবৎ লোক লোচনের সমক্ষে রাখিয়া নাম প্রেম বিতরণ করিলেন ; তৎপর না জানি কি যেন ভাবিয়া সপ্তদশবর্ষকাল আপনাকে আঁধার কুটীরে লুকাইয়া রাখিলেন। দ্বাদশবর্ষ অসূর্য্যম্পশ্য ভাবে থাকিবার পর যে দিন অল্প কিছুক্ষণের জন্য বহিরঙ্গণে পদার্পণ করিয়াছিলেন সেই দিনের স্মৃতিতে প্রতিবৎসর 'মধু বাসন্তী মহামহোৎসব' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে দিন, যে ভক্তরাজের অনুরোধে তাহার অঙ্গে অঙ্গ রাখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, তারপর শ্রীশ্রীপ্রভু মহাপ্রলয় বুকে করিয়া বর্ত্তমান দশা গ্রহণ করিলে পর সকলেই হতাশদগ্ধ হৃদয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলে, একমাত্র যাহাকে স্বরূপ চিনাইয়া মহান্ কর্ত্তব্য-কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, তাহারই প্রাণে বহুদিন হইতে এই বাসনা পোষিত হইয়া আসিতেছিল যাহাতে মহা-উদ্ধারণের মহালীলাস্থানগুলির পরিক্রমণ আরম্ভ হয়। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তাহার অন্তরের সেই সাধ পরিপূর্ণ হইবার সৌকর্য্য উপস্থিত হয় নাই।

আজ শ্রীশ্রীবন্ধু বাসন্তী মহামহোৎসবের জলকেলীর পরদিবস ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপধাম পরিক্রমণস্মৃতি বহন করিয়া আজ শ্রীশ্রীবন্ধুমহামণ্ডল পরিক্রমণোদ্দেশ্যে সেই শ্রীল মহেন্দ্রজীর আদেশে

দ্বাদশজন মহানামনিষ্ঠ বান্ধব সর্ব্বপ্রথম পরিক্রমায় বহির্গত হইবেন (বান্ধবগণের নাম—শ্রীআনন্দ দাস, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীবিজয়বন্ধু দাস, শ্রীবন্ধু হরিমাধব দাস, শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস, শ্রীকৃষ্ণকুমার দাস, শ্রীছোট কুঞ্জ দাস, শ্রীগুরুদানন্দ দাস, শ্রীসত্যস্বরূপ দাস. শ্রীরাধাচরণ দাস, শ্রীজুরাণ দাস ও লেখক জীবাধম)। প্রাতঃকাল হইতেই বান্ধববৃন্দ উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই মুণ্ডিত মস্তক হইয়া শ্রীকুণ্ডে অবগাহন করিলেন। পরে তিলক মালায় বিভূষিত হইয়া দাদার আশীষ গ্রহণ করিলেন। এবং শ্রীশ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ অন্তে প্রাণবন্ধু স্মরণে বেলা প্রায় দশটার সময় শ্রীঅঙ্গন হইতে বহির্গত হইলেন। বৃন্দাবন দাদা এবং বিজয়বন্ধু দাদার নিপুণ হস্তে মধুর মৃদঙ্গ, বিভিন্ন বান্ধবদের হস্তে শ্রীকরতাল ও কাশরাদি, মধ্যে মধ্যে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি, তৎসঙ্গে সেই বন্ধু সুন্দরের 'তোদের বুলি' বা মহা-উদ্ধারণ মহানামের ভুবন মঙ্গল রোলে দিগন্ত মুখরিত করিয়া পরমোল্লাসে বান্ধববৃন্দ নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন। শ্রীশ্রীবন্ধু মহাকুণ্ড ঐ পূর্ব্বভাগে বিদ্যমান। সর্ব্ব-তীর্থসম্মিলিত দুরিতহারী শ্রীকুণ্ডের উপর একটী ক্ষুদ্র সেতু আছে। তাহারই উপর আমরা উপস্থিত হইলাম। এই শ্রীকুণ্ডে প্রাণারাম বন্ধুহরি কতদিন পদ্মাসনে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। সোণার অঙ্গটী ডুবাইয়া দিয়া কতদিন বঁধুয়া ইহাতে সাঁতার খেলিয়াছেন। ঐ যে শ্রীপাদ কুঞ্জ দাদা কুণ্ডের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

> "শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড, যমুনা কালিন্দী।
> নদীয়ার পাপহরা গৌর গঙ্গা নদী॥
> আর যত পুণ্যতোয়া, ব্রহ্মপুত্র আদি।
> সর্ব্ব তীর্থ সম্মিলনে বন্ধুকুণ্ড নিধি॥"

এই কুণ্ডের ধারেই বন্ধুহরি গৌর কিশোর সাহা মহাশয়কে অন্ধকার নিশীথে পূর্ণ চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। কুণ্ডের তীরে তীরে এবং রাস্তার পাশে পাশে বিভিন্ন জাতীয় বিটপীরাজিরূপে মহাউদ্ধারণের অমিয়রস ধারায় সঞ্জীবিত হইবার জন্যই মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর লোকাদি বিরাজ করিতেছেন। একদিন বৃন্দাবনে তৃণ গুল্ম লতারূপ ধারণ করিয়া তাঁহারা নিকুঞ্জের লীলা দর্শন করিবার মহাভাগ্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, আজ বুঝি তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য মহা রাসেশ্বর মহা-উদ্ধারণচন্দ্র সকলকে আপন লীলাস্থলীর আশে পাশে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। ভক্ত বুঝি তাহাদের স্বরূপ অবগত হইয়াই বলিতেছেন :—

> "যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র রাজে তরুরূপ ধরি।"

শ্রীকুণ্ডের ধারে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া আমরা সম্মুখে অগ্রসর হইলাম। এই রাস্তাটিকে যশোর রোড বলে। প্রভু বন্ধুর চরণ রেণুতে এই পথের ধূলি চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ যেন গগনে পবনে সেই মহাভাব বিজড়িত রহিয়াছে। এই রাস্তা দিয়াই—মহাভাবে ভোরা বন্ধু গোরাকে ভক্তগণ প্রায় প্রতিদিন গাড়ীতে লইয়া বেড়াইতেন। গোষ্ঠ লীলার ন্যায় সংকীর্ত্তন রঙ্গে প্রাতঃ সন্ধ্যায় তখন নব গোষ্ঠবিহারী এই রাস্তা দিয়াই বিহারাদি করিতেন। অনতিদূরেই গৌরকিশোর সাহা মহাশয়ের বাড়ী। আমরা ক্রমে নিত্যানন্দ দাস কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। ইহার পূর্ব্বনাম নিবারণ। নিত্যানন্দ নাম প্রভু-প্রদত্ত। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। এই বাড়ীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে বাগানে শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দির ছিল। সেখানে তিনি সময় সময় অবস্থান করিতেন। বর্ত্তমানে স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ। আজ সেখানে বন জঙ্গল হইয়াছে বটে কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সেখানকার যাহা অবস্থা ছিল তাহাই স্মরণ করিয়া বান্ধব বৃন্দ আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই স্থানটী একদিন হরিনামে মধুময় থাকিত। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার মুনীন্দ্রদেব বাহাদুর এই স্থানেই চম্পটী ঠাকুরের সঙ্গে প্রভু দর্শনে আগমন করেন। পরে এই স্থান হইতেই মুণ্ডিত মস্তক হইয়া প্রভুর আদেশ বাণী পালন করেন। তাহার আভিজাত্যের গর্ব্ব সারাজীবনের উশৃঙ্খলতা চূর্ণীকৃত করিয়া এই স্থানেই প্রভু তাহাকে স্নেহের কোলে টানিয়া লন। এখান হইতেই কবিরাজ মহাশয় প্রদত্ত এক সরা লক্ষ্মীবিলাস বটিকা সেবন করিয়া বন্ধু বঙ্গরাজ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। ইহার নিকটেই ভক্ত কুঞ্জ মাষ্টার ও প্রফুল্ল সেনের নিবাস।

এখানে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে আবার সদর যশোর রোড ধরিয়া আমরা ব্রাহ্মণকান্দা অভিমুখে চলিলাম।

গোবিন্দপুরের বাড়ী পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে এ স্থানে বাড়ী করা হয়। শ্রীযুক্তেশ্বরী দিগম্বরী দেবীর হস্তে এখানেই বন্ধু গোপাল লালিত পালিত হন। এই ব্রাহ্মণ কান্দা হইতেই সরস্বতীপতি বন্ধুসুন্দর ফরিদপুর জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। আমরা যে পথ বাহিয়া চলিতেছি এই পথ দিয়াই একদিন বন্ধুহরি তাঁহার মাধুর্য্যভরা ননীর দেহটী হেলাইয়া দোলাইয়া পুস্তক হস্তে পড়ুয়ার বেশে গমন করিতেন। সম্মুখেই রাস্তার বামপার্শ্বে সরকারী কৃষি অফিস। তাহার অধ্যক্ষ রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ মিত্র প্রভুর মর্ম্মী ভক্ত। এই কৃষিক্ষেত্রের পাশ দিয়া ছোট একটী রাস্তা বড় রাস্তা হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণকান্দা শ্রীঅঙ্গনের দিকে গিয়াছে। এখানে উপনীত হইয়া শ্রীপঞ্চবটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে বান্ধবগণ শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ বান্ধব-বর যজ্ঞেশ্বর দাদা এখানে সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাইত রূপে আছেন। তিনি কোন কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাওয়ায় শরৎ ভাই আসিয়া শ্রীশ্রীভোগরাগের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেহ বা শ্রীঅঙ্গনের সম্মুখস্থিত 'জগত-সরসীর' পবিত্র নীরে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আহা! এই সেই জগত সরসী; যে কতদিন পদ্মাসনে উপবিষ্ট সোনার কমল শ্রীবন্ধুকে বুকে ধরিয়া ধন্য হইয়াছে! বর্ত্তমানে যেখানে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নিকটেই পূর্ব্বে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির ছিল। শ্রীশ্রীপ্রভু নিজে সময় সময় এই শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেন। প্রভু যেদিন সেবা পূজা করিতেন সেদিন যেন শ্রীবিগ্রহের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত। কোনদিন তিনি রাধা সাজে শ্রীবিগ্রহের নিকট কৃষ্ণসঙ্গ কামনা করিতেন কোনদিন বা কৃষ্ণ সাজে রাই ঋণ শোধ করিয়া বিশ্ব জগতকে প্রেমময় করিয়া তুলিবার জন্য সদৈন্যে নিবেদন করিতেন। ধন্য মহাবতারীর পৌগণ্ড কৈশোর লীলাভূমি ব্রাহ্মণকান্দা!

প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়, যাহাকে প্রভু একদিন প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমেরিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথম তিনি তার প্রাণ কানাইর খোঁজে এখানেই ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। 'প্রাণ কানাইয়া সেত তুই রে?' ভারতী মহাশয়ের এই চিঠিখানি—এই ব্রাহ্মণ কান্দার ঠিকানেতেই প্রেরিত হইয়াছিল। পুনরায় গোলোকমণি দেবী এবং পূজনীয় প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় এখানেই শ্রীশ্রীপ্রভুকে বিষ্ণুমূর্ত্তিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে দর্শন করেন এবং 'জগত' যে সাধারণ মানুষ নয়, স্বয়ং শ্রীহরি ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া লন। শ্রীমৎ রামদাস প্রভৃতির পরিবর্ত্তনও এখান হইতেই আরম্ভ হয়। এখানেই একদিন রামদাদা (রাধিকা গুপ্ত) প্রভুর অলৌকিক জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ যে প্রভু শ্রীমতি নিস্তারিণী দিদিমার নিকট এখানেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন 'আমি গৌরাঙ্গ'। দিদিমা অবিশ্বাস করিলে বলিতেছেন 'পরে জানবি।' ঐ যে প্রভু সুন্দর কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়া সংকীর্ত্তনানন্দে আত্মহারা হইতেছেন। একদিন প্রভু খোল বাজাইয়া ভক্তগণ সহ আনন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময় দেবী দিগম্বরী সবিস্ময়ে দেখিলেন, যে একটী অপূর্ব্ব রশ্মি প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যের সঙ্গে মিলিয়া গেল। এখানে প্রভু অনেক সময় চৌদ্দ মাদলের সঙ্গে নগর কীর্ত্তনে বহির্গত হইতেন। এখানে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া বহুদিন ছিলেন, তিনি যাইবার সময় বলিয়া যান "এ ছেলে সামান্য নয় স্বয়ং পদ্মপলাশলোচন হরি।" শ্রীশ্রীপ্রভুর বাল্য শিক্ষক ঈশ্বর মাষ্টার এখান হইতেই প্রথম প্রভুর কৃপা লাভ করেন। ইহার নিকটেই একটী বকুল গাছ ছিল ভক্তগণকে ঐ গাছ ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রথম প্রকাশ এই ব্রাহ্মণকান্দা হইতেই আরম্ভ হয়। স্থানটী স্বভাবের অতি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে পরিশোভিত এবং পরম নির্জ্জন। প্রকৃতি দেবী যেন অতীতের সেই বন্ধুলীলা স্মরণ করিয়া পরম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন।

আমাদের মহাপ্রসাদ পাইবার সময় উপস্থিত হইল। বান্ধবগণ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে কীর্ত্তন সহিত শ্রীমন্দির ও পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ করিয়া বদরপুরের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। এই

বদরপুরেই বীরভক্ত বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে অনেক লীলাখেলা হইয়াছে। বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী প্রবেশ করিতেই একটী তেঁতুল গাছ আছে। এই বৃক্ষের নিম্নে শ্রীশ্রীপ্রভু অনেক রাত্রিতে আসিয়া শয়ান থাকিতেন। মাধুর্য্য-বিগ্রহ বন্ধুহরির পরশ পাইয়া এই বৃক্ষের তেঁতুলও মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহা এখানে প্রসিদ্ধ। প্রভু-প্রসাদী এই বৃক্ষের তেঁতুলের বৈশিষ্ট্যে পাকিতে না পাকিতেই সকলে লুটপাট করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রভু যে মন্দিরে থাকিতেন তাহার ভিত্তিটী এখনও বর্ত্তমান আছে। উহা ঘিরিয়া ঘিরিয়া বান্ধববর্গ আনন্দের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইস্থানে একদিন বহু দেশবিদেশের ভক্তবৃন্দ সমাগত হইতেন। হরিনামে বিশ্বাস মহাশয়ের পর্ণকুটীরখানি সদাসর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। বালক ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর ঘনিষ্ঠতা এখান হইতেই আরম্ভ হয়। এখানেই রঙ্গনটবর বন্ধুহরিকে বিষধর সর্পে দংশন করে। সরল বিশ্বাসী ক্ষুদিরাম সাহা এই স্থানেই শ্রীশ্রীপ্রভুকে যুগলমূর্ত্তিতে দর্শন পান। নগরবাড়ী পাবনার জমিদার বিহারীলাল চৌধুরী এখান হইতেই বন্ধুসুন্দরের শ্রীহস্তের কয়টী অঙ্গুলী মাত্র দর্শন করিয়া ঐ রাতুল রাঙা চরণতলে আত্মসমর্পণ করেন। ইহার পরেই তিনি ভাগবত জীবন লাভ করিয়া নবদ্বীপে গৌর-গঙ্গায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া ছিলেন। এই বদরপুরেই একদিন অনন্ত কোটী বিশ্বসম্রাট শ্রীশ্রীহরিপুরুষ বাকচরের ভক্তপ্রধান শ্রীযুত মহিম চন্দ্র দাসকে আপনার পদ্মহস্ত দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ্ আমার হাতে রাজলক্ষণ আছে।" মহামহাভাবোন্মাদের সময় দিগম্বর বেশধারী প্রভুসুন্দর এই বদরপুরেই নিম্নোক্ত আত্মপরিচয় স্বহস্তে শ্রীযুত সুরেশ বাবু এবং ডাক্তার শ্রীধর বাবুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন—

১। আমি ভিন্ন কিছুই নাই। ২। হরি। ৩। মহা-উদ্ধারণ। ৪। পুরুষ। ৫। জগদ্বন্ধু। ৬। সৃষ্টি।

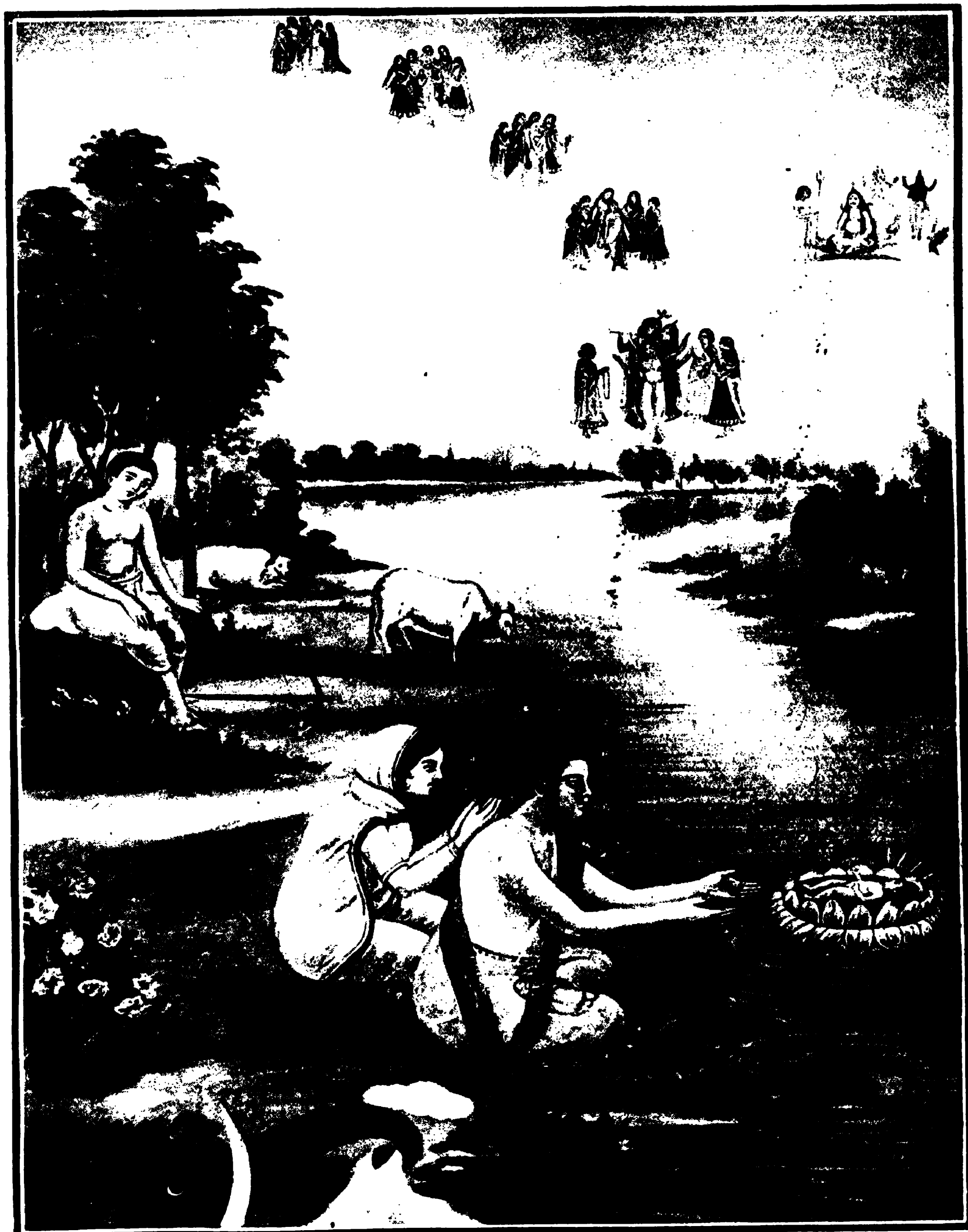
এখান হইতেই মোহান্ত ভক্তগণ হরিনাম সহ প্রভুকে কাঁধে করিয়া লইয়া বেড়ান। উহাদের আনীত জল পান করিয়া বলেন, "ওরা হরিনাম ক'রে, ওরা পবিত্র। সহুরে বাবুরা queens' houseএ যায়, ওদের গায় গন্ধ তাপ।" নিকটেই বিশ্বাস মহাশয়ের মাতুলালয়। এখানে প্রতি বৎসর শক্তি পূজা অনুষ্ঠিত হইত এবং তদুপলক্ষে ছাগ বলি দেওয়া হইত। এক বৎসর শ্রীশ্রীপ্রভু উক্ত জীবহত্যা প্রথা উঠাইয়া দিতে বলেন। কিন্তু তাহারা বন্ধু হরির ঐ কথায় কর্ণপাত না করিয়া ছাগ বলিদান সহকারেই মাতৃপুজা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। তদনুসারে তাহারা বলিদানের জন্য আনীত ছাগ উৎসর্গ করিয়া যুপকাষ্ঠে স্থাপন করেন, এবং খড়্গ দ্বারা ঐ প্রাণীটির বধের জন্য উদ্যুক্ত হন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খড়্গের আঘাত করা হইল কিন্তু তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না। তাহাতে তাহারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু প্রতি আঘাতই ব্যর্থ হইল। ছাগ বধ হইল না। তখন সকলেরই প্রভুর নিষেধ বাণীর কথা মনে জাগিয়া উঠিল। তখন সকলে আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিহীন পূজাতেই মাতৃ আবাহন কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

প্রভুগতপ্রাণা ভক্তিমতী রামার মা এখানে থাকেন। তাঁর ওখানে নিত্যসেবা এবং শ্রীশ্রীপাদুকা সেবা আছেন। ইহার দুই পুত্র রাম এবং ভগীরথ অতি অল্প বয়সেই প্রভুর কৃপা পাইয়া খোল বাজনায় এবং কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব অধিকার লাভ করে কিন্তু কৈশোর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাহারা নিত্য কিশোর বন্ধুর ধামে গমন করিয়াছে। বাদল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী যেখানে ছিল তার অনতিদূরেই কানাই মিত্র মহাশয়ের বাড়ী। শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রাহ্মণকান্দা থাকিবার সময়েই ইহাঁকে কৃপা করেন। খোল বাজাইতে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন ভক্তদের মধ্যে ইনি অন্যতম। আজ মাত্র কয়দিন হইল প্রভু ইহাকে ইহজগত হইতে সরাইয়া লইয়াছেন। প্রাচীন ভক্তদের একটী একটী প্রেম-প্রদীপ এমনি করিয়াই নিভিতেছে। আমরা কীর্ত্তনসহ সেখানে উপস্থিত হইলাম এবং গ্রামের কিয়দংশ পরিক্রমণ করিলাম। নিকটেই রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আবাস। এখানেও প্রভু সময় বিশেষে আসিয়াছেন। পরে আমরা শ্রীধাম বাকচরের পথে অগ্রসর হইলাম।

বন্ধুপদরেণুপূত রাজবাড়ীর রাস্তা দিয়া আমরা যাইতে

জন্মরহস্য

"আমি অযোনি সম্ভব"



'আমি প্রভু জগদ্বন্ধু ক্ষণে জন্মিয়াছি। আমার জন্মস্থানে পাঁচটি তুঙ্গ আছে, আমার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন আছে। বিশ্বাস না হইলে বাজারে যাচাইয়া নেও"

লাগিলাম। কতদিন প্রভু এই পথ দিয়া বাকুচর গিয়াছেন এবং তথা হইতে বদরপুর, ব্রাহ্মণকান্দা এবং গোয়ালচামট ফিরিয়াছেন! কত রজনীতে ভক্তগণ লইয়া এই রাস্তার ধারে যাপন করিয়াছেন! একদিন ভক্তবর গোপাল মিত্রকে সঙ্গে লইয়া নীরব নিশীথে রাস্তার ধারে শষ্পবীথিতে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মিত্রজী এইরূপ নির্জ্জনে প্রাণবন্ধুকে পাইয়া তাঁর স্বরূপ তত্ত্বটী অবগত হইবার আশায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "আপনি কে?" ভক্তের কাছে তখন প্রভু নিজের কথা বলিতেছেন,—"আমি কেহ নহি, একটা চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে সব লক্ষণ ছিল তাহা আমাতে আছে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সব লক্ষণ ছিল তাহাও আমাতে আছে। অমুকের (শ্রীরাধার) যে সব লক্ষণ ছিল তাহাও আমাতে আছে। তোরা দেখ্‌বি কি? তোরা কি চিন্‌তে পারিস্? আমার রাজটীকা আছে। উনিশটী লক্ষণ আছে।" আর একদিন শ্রীধাম বাকুচর হইতে মৌনাবলম্বনের কিছু পূর্ব্বে বন্ধু সাহা মহাশয়ের সঙ্গে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে আসিতেছেন। ঐদিন নিম্নোক্ত ভাবের তত্ত্বকথাগুলি তাঁহাকে শুনাইতে শুনাইতে আসিতেছিলেন:—"আমাকে ত কেউ চিন্‌ল না। আমি জীবের উদ্ধারের জন্য এসেছি। আমাকে সেই হরি বলিয়া জানিও। তোদের মহাপ্রভু ছিল পৌণে চার হাত, আমি চার হাত। আমার হাত কেউ এড়াতে পার্‌বে না। যে যেদিক্ দিয়াই যাক্ না কেন, আমার কাছে আস্‌তে হবে। ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি ডুরি আমার হাতের মধ্যেই আছে।" শ্রুত আছি, অন্য একদিন ভক্তগণ সহ এই রাস্তার পাশে বসিয়াই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "কালে এমন একদিন আস্‌বে, যখন এখানে বড় বড় ষ্টীমার সকল নোঙ্গর ক'রে থাক্‌বে।" ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যে সবই হইতে পারে। সুতরাং ওখানে একদিন ষ্টীমার নোঙ্গর করিবে এ আর অধিক বিচিত্র কি? অন্য একদিন বালক ভক্তগণ সহ নৈশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এইখানে আসিয়াছেন। আসিয়াই অদূরের একটী বাব্‌লা গাছ ঘিরিয়া সকলকে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তখন ঝড়বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও মর্ মর্ শব্দ এবং ঝুপ্‌ঝাপ বৃষ্টি পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া প্রভুর কাছে ছুটিয়া আসিলে, রঙ্গিয়া বন্ধুসুন্দর বলিয়াছিলেন, "গান বন্ধ না কর্‌লে একটা মহাত্মার দর্শন পেতিস্। * * তোদের মুখে হরিনাম শুনে তিনি মুক্ত হলেন।" এই সমস্ত সুখস্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে মহানাম রোলে চতুর্দ্দিক আলোড়িত করিয়া আমরা পথ চলিতেছি। ওদিকে দিনমণি আবির রাঙা রঙ্‌ ছড়াইয়া অস্তাচলে ডুবুডুবু হইতেছেন। যখন বন্ধুহরি ছায়াতল অতিক্রম করিয়া যাইতেন তখন এই পথের তরুরাজি আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিত। বহুদিন যাবৎ প্রাণের দেবতার অদর্শনে তাহারা যেন বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়াছে। আমরা পরাণপুরের কাছে যাইতেই সন্ধ্যা ঘোর হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভু ত্রিকাল গ্রন্থে এই পরাণপুরকে 'সিন্ধুরা' আখ্যা দিয়াছেন। কালের কুটিলা গতিতে আজ যেখানে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কাল সেখানে তরঙ্গায়িত বিশাল সমুদ্র। আজ যে পরাণপুর আমরা অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, মহাউদ্ধারণ মহালীলা অভিনয়ের দিনে সেখানে যে রূপান্তর আসিবে তাহা কল্পনা করিতেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই পরাণপুরেই বন্ধু রাঘবের গুহক চণ্ডাল জন্মেজয়ের বাস ছিল। 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ' বাণীটার সার্থকতা তিনি তাঁহার জীবনে বর্ণে বর্ণে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁর নিয়ম নিষ্ঠা সদাচরণ, প্রেমভক্তিতে দ্বিজ কুলও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এমন কি পবিত্রতার বিকাশে তার অঙ্গ হইতে একটা দিব্য গন্ধও বহির্গত হইত। বনফুলের মতই তিনি একদিন এই গ্রামটিকে পরম শোভিত রাখিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতৃগণ আজও আছেন। এই পরাণপুরের একটি পরমা ভক্তিমতী মা আছেন। ভক্ত দেখিলেই মা পুত্র বাৎসল্যে সকলকে আপ্যায়িত করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার আজ বন্ধু সেবার আনন্দে কাল কাটাইতেছেন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাসের (ভুবন মোহন ঘোষ) ভ্রাতা মতিলাল ঘোষ প্রথমে এখানে সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং চতুষ্পার্শ্বের নরনারীকে বন্ধু নামে মাতোয়ারা করিয়া তোলেন। ইনি নিষ্ঠাবান পরম ভক্ত ছিলেন। বহুদিন হইল ইনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। বান্ধববর রাখাল এখানেই প্রথম প্রভুর কৃপা লাভ করেন। একদিন তিনি নৌকা যোগে দূর হইতে শ্রীশ্রীপ্রভুর শরদিন্দু-

নিভ পাদপদ্ম এবং নিরুপম কান্তি চন্দ্রবদনের কিয়দংশ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা ক্রমে ঐ মাতার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। তথা হইতে আমরা বন্ধুগত প্রাণ বিপিন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর উপর দিয়া বাকচর যাত্রা করিলাম। শ্রীশ্রী প্রভুর নির্দ্দেশিত পুতঃ সলিলা কাবেরীর তীর দিয়াই পথ। ধীর মন্থর গতিতে কাবেরী রাণী বন্ধু মাণিকের বিরহে মুহমানা হইয়াই যেন কুলু কুলু রবে আর্ত্তনাদ করিয়া ঐ শ্রীঅঙ্গন অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কতদিন প্রভু বাকচরের ঘাট হইতে ডুব দিয়া এখানে আসিয়া উঠিয়াছেন। কতদিন প্রভু এই কাবেরীর অতল কোলে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া ভক্তগণকে দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছেন। কালীয়হ্রদ নিমজ্জিত কালাচাঁদের অদর্শনে যেমন ব্রজ রাখালগণ একদিন আকুল হইয়া উঠিতেন, নব-ব্রজধাম বাকচরের রাখাল ভক্তগণও তেম্নি প্রভুকে না দেখিয়া অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। ক্রমে আমরা শ্রীধাম বাকচর শ্রীঅঙ্গনের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্ধুদাস।

মহাধর্ম্ম মীমাংসা।

কোন বই পড়িতে হইলে, খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই হয়, কিন্তু আমার প্রভুর কোন লেখা পড়িতে হইলে সে লেখার নাম (heading) হইতে পড়িতে হয়। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যেমন নাম ও নামী অভেদ, তাঁহার গ্রন্থের নামের সঙ্গেও তৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রায় তেমন ধারা একটা অভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত গ্রন্থ মধ্যে পাঁচখানি প্রধান—হরিকথা, চন্দ্রপাত, ত্রিকাল গ্রন্থ, উদ্ধারণ ও শ্রীমতী সংকীর্ত্তন। এই প্রত্যেকটী নামকরণের মধ্যেও একটী রহস্য নিহিত আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে যথামতি তাহা আস্বাদন করিব। প্রথমতঃ ত্রিকাল গ্রন্থের নামকরণ আলোচনীয়।

বর্ত্তমানে বহু বান্ধব এই সকল গ্রন্থরাজি লইয়া প্রাণপণ আলোচনা ও অর্থনিষ্কাশনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা পরমানন্দের ও শ্লাঘার বিষয়, এই সকল ব্যাখ্যাকারিদের মধ্যে স্বনামধন্য পণ্ডিতকুলচুড়ামণি শ্রীল দামোদর লালাজীর নাম অন্যতম, তিনি শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থের একটী ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, তা ছাড়া অনেক ভক্ত চন্দ্রপাত ও ত্রিকালের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন তবে কেহই এ পর্য্যন্ত মুদ্রন সম্পাদন করিয়া প্রচারে সাহস করেন নাই। 'এই ব্যাখ্যাই ঠিক কিনা' নিজ নিজ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সকলেই এরূপ সন্দিহান আছেন। আর সেইরূপ সন্দেহ থাকাই উচিত। ভক্তের কোন রচনার উপর টীকা ব্যাখ্যা করা আলাদা কথা, কিন্তু স্বয়ং প্রভুর লেখনীর উপর কোন ব্যাখ্যা করিবার সময় সকলেরই মনে রাখা উচিত—আমি ব্যাখ্যা করিতেছি না—ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

"ত্রিকাল গ্রন্থ" এই নাম সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন ত্রিকালের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম ত্রিকাল গ্রন্থ। এই ব্যাখ্যা বেশ সহজ, সাদাসিধে, কিন্তু সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একটু চিন্তা করিতে হয়, যে পৃথিবীতে লক্ষ কোটী গ্রন্থ আছে, কোনও গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'গ্রন্থ' এই পদটী যুক্ত নাই ভাগবতের নাম ভাগবত গ্রন্থ নহে, শ্রীচরিতামৃতের নাম শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ নহে, হরিকথার নাম হরিকথা গ্রন্থ নহে, গ্রন্থের নামের সঙ্গে পুনরায় গ্রন্থপদ যোগকরার কি কোনও তাৎপর্য্য নাই? নাই বলিলে বিলক্ষণ; প্রভু বৃথাই ঐ অক্ষরদুটী প্রয়োগ করিয়াছেন! আর আছে বলিলেই ভাবিতে হইবে।

আমরা নাই বলিতে রাজী নহি। তবে কি অর্থে ঐ পদটী দিয়াছেন তাহাই অনুধাবনীয়। প্রথমসূত্র—"ত্রিকাল ফক্কিকার" আলোচনা করিলেই ত্রিকাল পদের অর্থ বাহির হইতে পারে। হইলে পরে ত্রিকাল গ্রন্থ নামকরণ রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস পাইব।

কেহ কেহ মনে করেন, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ হইতে কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত কালকে ত্রিকাল কহে, কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না,—কারণ ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই তিনটীকেই কেহ কাল আখ্যা দেন না—ত্রেতা কাল, দ্বাপর কাল, এরূপ কোথাও পাইনা—যুগ শব্দের সঙ্গেই তাহারা নিত্য সম্বন্ধ। কেবল কলির সঙ্গে কাল শব্দটীর মিল হওয়ার কারণ—অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে, সত্য শব্দের সঙ্গে কাল শব্দের মিল থাকিলেও তাহাকে ত পরিবর্জ্জনই করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যেমন বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ভেদে মানব জাতিকে ভাগ করা উচিত নহে; তদ্রূপ ত্রেতাদি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা লইয়া কাল বিভাজ্য নহে।

যুগ ও কাল যদি একার্থক বলিয়া ত্রেতাদিকে কালই ধরিয়া লই, তথাপি সত্যকে বাদ দিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না, বরং সত্যকে বাদ দেওয়া অন্ধতার পরিচায়ক। কারণ চক্ষু খুলিয়া ত্রিকাল গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা দেখিলেই বড় অক্ষরে সত্যযুগ শীর্ষক বহুসূত্র পরিদৃষ্ট হয়। যে ত্রিকালের বর্ণনার জন্য গ্রন্থের নাম ত্রিকাল গ্রন্থ হইয়াছে, সেই ত্রিকালের অর্থ যদি ত্রেতা দ্বাপর কলি হয় তবে ত্রিকাল গ্রন্থ হইতে ঐ অংশ বাদ দিতে হয়। এইরূপ বাদ দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই।

ত্রিকাল পদে ত্রেতাদি যুগ বলিয়া ফক্কিকার অর্থে ফাঁকি বুঝিলে ত্রেতাদি কালকে মিথ্যা বলা হয়, কিন্তু কোন শাস্ত্রে বা প্রভুর লেখনীতে তাদৃশ ভাব পরিলক্ষিত হয় না। ত্রেতাদি যুগ ও তৎতৎ যুগের বর্ণনীয় বিষয় যদি মিথ্যাই হয়, তবে শাস্ত্রের অনেক তত্ত্বকে অস্বীকার করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ কলিকে মিথ্যা ত বলেনই নাই, বরং 'ধন্য কলি শত ধন্য' বলিয়াছেন। "সত্য যুগে ছিলেন হরি" এই পর্য্যন্তই পাই কিন্তু তাৎকালীন কোন বর্ণনা পাই না। 'ত্রেতায় রাম ধনুকধারী' হইতেই এ পর্য্যন্ত পুরাণ শাস্ত্র যা কিছু পাইয়াছি সব ফাঁকি বা অসত্য বলিবার মত সাহস আমার নাই।

ত্রিকাল এই পদটীর গর্ভে দুইটী শব্দ আছে। শব্দ দুইটী বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে সম্বদ্ধ। ত্রি বিশেষণ, কাল বিশেষ্য ইহার সমাস বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। 'ফক্কিকার' আর একটী বিশেষণ। এই বিশেষণটী কাহার? আপাততঃ মনে হয়, কাল এই বিশেষ্যেরই বিশেষণ এবং সেইরূপ মনে করিয়াই ত্রেতা দ্বাপর, কলি এই তিনকাল ফক্কিকার বা ফাঁকি এরূপ অর্থ করা যায়, বস্তুতঃ তাহা নহে। ত্রিকাল দুইটী পদ হইলেও এক পদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ফক্কিকার এই বিশেষণ কালের উপর না পড়িয়া ত্রি এই বিশেষণের উপর পড়িবে। বিশেষণ যুক্ত কোন বস্তুর নিষেধ বা গ্রহণ হইলে মুখ্যতঃ বিশেষণেরই গ্রহণ হয় বিশেষ্যের নহে। যদি বলি কীর্ত্তনে ভাল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন না তবে কি বোঝা যায় যে মোটেই কীর্ত্তনীয়া ছিলেন না, নাকি কীর্ত্তনীয়া ছিলেন—তিনি ভাল ছিলেন না। যদি বলি, তিন খানা খোল নাই, তবে কি বুঝিব যে খোল মাত্র নাই—নাকি খোল আছে, কিন্তু সংখ্যায় তিন খানি নাই। ফক্কিকার অর্থ অসত্য হইলে তাহা দ্বারা কালের ত্রিসংখ্যাত্বের অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কালের অসত্যত্ব গ্রাহ্য হয় না বরং তাহার সত্যতাই উদ্দিষ্ট হয়, যেমন তিনখানি খোল নাই বলিবে খোল আছে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না তদ্রূপ ত্রিকাল ফক্কিকার বলিলে কাল যে ফক্কিকার নহে তাহার ত্রিত্বই ফক্কিকার ইহাই বুঝিতে হয়। যাহা হউক, এতাবতা আমরা প্রভুর সূত্র হইতেই পাইলাম;—

কাল ধর্ম্মী তাহা অসত্য নহে। তাহাতে আরোপিত ত্রিত্ব নামক যে একটি ধর্ম্ম তাহাই ফাঁকি।—এই কাল কি তাহা বুঝিতে হইবে তাহার ত্রিত্ব কি তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে ফক্কিকার কথাটির তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক।

'ফক্কিকা' একটি সংস্কৃত শব্দ তাহা ফাঁকি অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ শব্দটি বিশেষ্য। প্রভু বোধ হয় 'র' প্রত্যয়টি যোগ করিয়া তাহা বিশেষণ ভাবাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ফক্কিকার অর্থ কেবল ফাঁকি বা ভ্রম বুঝিলেই কার্য্য উদ্ধার

হইবে না। ভ্রম জ্ঞান দ্বিবিধ বস্তুতে বস্তু ভ্রম আর অবস্তুতে বস্তু ভ্রম। একগাছি রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রম হইল, ইহা বস্তুতে বস্তুভ্রম। ইংরেজি শাস্ত্রে বলে Ilusion, কখনও এমন হয় যে আমার চোখের সামনে কিছুই নাই তবু যেন দেখিতেছি একটা ভূত দাড়াইয়া আছে। ইহা অবস্তুতে বস্তুভ্রম—ইংরেজীতে বলে Hallucination. এই যে কালের ত্রিত্ববুদ্ধি ইহা যদি ফাঁকি বা ভ্রমজ্ঞানজাত হয় তবে ইহা কোন জাতীয় ভ্রম। কালেতে কি একত্ব বা দ্বিত্ব কোনরূপ ধর্ম্ম আছে যেখানে ত্রিত্বের ভ্রম হইতেছে, নাকি কোন ধর্ম্ম নাই। অকারণ ঐরূপ একটা ভুল হইতেছে। আমরা দেখি বস্তু মাত্রেরই সংখ্যা আছে অলীকবস্তু বাদে সর্ব্বত্রই সংখ্যাত্ব বিরাজমান। শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন "কৃষ্ণ একলেশ্বর" অন্যত্র ব'লিয়াছেন "আমি একক।" ইহা হইতে আমরা পাই পরম বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ বা তিনি স্বয়ং, তাঁহাতেও একত্বরূপ সংখ্যা আছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে শ্রীশ্রীপ্রভু কালকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা হইলে সংখ্যাত্ব রূপ বস্তুধর্ম্ম কালেতে আছেই। এখন ত্রিত্ব পদে যদি বহুত্ব লক্ষণা করি তবে কার্য্যতঃ কালের একত্ব সিদ্ধ হয় আর ত্রিত্বের যদি লক্ষ্যার্থ অস্বীকার করিয়া বাচ্যার্থই লই তথাপি দ্বিত্বাদির সমর্থক কোন সৎ হেতু না থাকায় ফলতঃ একত্ব সিদ্ধ হয়।

অতএব প্রভুর সূত্র হইতেই আমরা অর্থ পাইলাম,—যে একত্ব সংখ্যা বিশিষ্ট কাল নামক যে একটি সদ্বস্তু তাহার যে ত্রৈবিধ্য তাহা ভ্রম বিশেষ। এস্থলে আর একটি কথা এই যে সংখ্যার জ্ঞানটাই অপেক্ষা বুদ্ধি জাত। এই যে আপনার হাতে দুইখানি করতাল রহিয়াছে এই 'দ্বিত্ব' সংখ্যা ঐ করতালজোড়াতে রহিয়াছে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে মনে করি যে এই যে করতালের দ্বিত্ব ইহা আমার হাতে থাকিলেও থাকিবে, না থাকিলেও থাকিবে। কিন্তু দর্শন যাহাদের দর্শনইন্দ্রিয় তাহারা সে কথা বলেন না, তাহারা বলেন যে যখন কোন দর্শক জানিতেছে যে এই একহাতে একখানি করতাল আর এই আর এক হাতে একখানি করতাল—ঠিক তখনই এখানে দুইখানি করতাল যদি পৃথিবীতে ঐরূপ অপেক্ষা বুদ্ধি বিশিষ্ট কোন জীব না থাকিত তবে ঐ করতালের উপর দ্বিত্ব সংখ্যা থাকিতে পারিত না।

এখন আমাদের কালেতে আমরা দুইটি সংখ্যা পাইতেছি একটি একত্ব তাহা সত্য, আর একটি ত্রিত্ব তাহা মিথ্যা। আমাকে এখন দুইজন বুদ্ধি বিশিষ্ট দর্শক স্বীকার করিতে হইবে। একজন কালকে 'এক' বলিয়া ঠিক ঠিক জানিতে-ছেন—আর একজন তিন বলিয়া ভুল জানিতেছে। এখন এই দুইজন কে? আর ঐ তিনই বা কি? আমরা দেখাইয়াছি সে ত্রিত্ব ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগাত্মক নহে। তবে তাহা কি? শ্রীশ্রীবন্ধু বান্ধববর্গের করুণা সম্বল করিয়া ক্রমে আস্বাদন করিবার আশায় থাকিলাম॥

(ক্রমশঃ)

মহানামব্রত।

"নরজাতি দেবত্ব"

'ত্রিকাল গ্রন্থ'

আজকাল 'স্বজাতির উন্নতিবিধান,' জাতীয় আন্দোলন, 'জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সরকারী পদপ্রাপ্তি' 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রভৃতি ব্যাপারে জাতি কথাটার উপরে সকলেরই বেশ একটু নজর প'ড়েছে। সমাজহিতৈষী উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতামঞ্চ কাঁপাইয়া বল্‌ছেন—"ভাই সব, আর কতকাল মোহনিদ্রায় থাক্‌বে, একবার উঠ, জাগো—নিজের জাতির দিকে তাকাও, দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন কর।" স্বদেশহিতৈষী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে এই নীতি দেশে প্রচার কর্‌ছেন—"ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, হিংসা দ্বেষ ছাড়, একত্র হও, দেশের গৌরব বৃদ্ধি কর।"

সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লবী চোখ রাঙাইয়া, যত দোষ সব পূর্ব্বপুরুষের উপর দিয়া আজ সমস্ত মানবকে মহাসম্মেলনের পুণ্যক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত। আর সর্ব্বোপরি বিশ্বপ্রেমিক তাঁর বিশ্ববিমোহন প্রেমের মুরলী নিনাদে হিংসা দ্বেষ-কলহ দগ্ধ শান্তিপিপাসু মানবকুলকে মোহনিদ্রার মোহ ভাঙাইয়া—আত্মস্বরূপ বোধের জন্যই যেন পুনঃ পুনঃ বলছেন—"শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

জাতির গোড়ার কথার আলোচনায় নানালোকে নানা কথা বলবেন—কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল সম্ভবপর নয়—কেন না প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক্ হ'তে এই 'জাতিকে' দেখছেন। তাই বর্ত্তমানে সমস্যা এই যে জাতির বাস্তবিক নিত্য স্থায়ী কোন স্বরূপ আছে—না ও জিনিষটা একটা কথার কথা বা ভুয়ো জিনিষ। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের দিকে তাকাইলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি অসংখ্য জীবজন্তু কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষলতাদি সৃষ্টি ক'রে তাঁর লীলাময় নাম সার্থক করেছেন। এখন সৃষ্ট জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রত্যেকেই এক একটা জাতি বা শ্রেণী এই হিসাবে উল্লিখিত জাতিগুলি হ'তে আবার বহু প্রকার জাতি বা শ্রেণী ভাগ করা যায়। প্রাণিগণের ভিতর এইরূপ ভাবে মানুষ বা নর এক জাতি, এই নরজাতিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

দেশ হিসাবে—ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি, ধর্ম্মহিসাবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি, কর্ম্ম হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি, সকলেই বস্তুতঃ সেই বিশাল নরজাতিরই শাখা প্রশাখা। আর বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ও কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে এই সাধারণ বিশাল মানবজাতি বা মানবসমষ্টিকে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হ'য়েছে। কিন্তু উল্লিখিত যে সব বিভাগের কথা বলা হ'য়েছে তাহা বিশাল মানবজাতির অন্তর্বিভাগ বা আভ্যন্তরীণ ভাগপরিচয়। ইতিহাস ভূগোল বা সামাজিক গ্রন্থাদি হ'তে ঐ সমস্ত ভাগগুলি যথাযথ বা সম্যক্‌ভাবে জানা যেতে পারে, তজ্জন্য ঐ সমস্ত বিভাগের কথাও বলার এখানে প্রয়োজন নাই বলিলেও চলে।

আমাদের আলোচ্যবিষয় বহির্বিভাগ। এখন এই বহির্বিভাগটা কি তাই আমাদের অনুসন্ধান করতে হ'বে। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতা প্রভৃতি ল'য়ে এই আশ্চর্য্য পরিদৃশ্যমান জগৎ। এখানে এই নরজাতিকে 'নরজাতি' কেন বলা হয় অর্থাৎ কোন্ বৈশিষ্ট্যদ্বারা ইহা অন্যান্য জীব ও জড় জগত হ'তে পরিচ্ছিন্ন তাহাই আমাদের দেখতে হবে। যেমন গলকম্বলাদি বিশিষ্ট পশুকে গরু নামে আখ্যা দেওয়া হয় তেমনি এই মানবের সকল জীবের ও জড়ের চেয়ে কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে মানব 'নরজাতি' এই উপাধি পাইতে পারে।

এ তত্ত্বালোচনায় নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞ নানা উপায়ে নানা যন্ত্রাদি প্রয়োগে 'নর'কে হয়ত বিশ্লেষণ করে দেখছেন বা দেখতে পারেন। অসম্ভব-সম্ভবকারী, অঘটন-ঘটন যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিকগণ তাদের যন্ত্রাদি ল'য়ে নরকে বিশ্লেষণ করতে বসলেন। বিশ্লেষণ (analysis) ও সংশ্লেষণ (Synthesis) এই দুইটা বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র বা উপায়। বিশ্লেষণে যাহার স্বরূপ ধরা পড়েনা এবং সংশ্লেষণেও যাহার উৎপত্তি নির্ণীত হয় না—তাহা একরূপ বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বাইরে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষু ল'য়ে যদি অগ্রসর হই, তবে হয় ত নরের জীবন মরণ রহস্যেরও খানিকটা জানবার সুযোগ হ'বে, কিন্তু 'নরজাতির' জাতিত্ব যে কি তাহা জানবার বিশেষ সুবিধা নাই।

বৈয়াকরণ বা আলঙ্কারিকের চক্ষু ল'য়ে দেখতে প্রয়াস পাইলে হয়ত একটু সুবিধা হ'তে পারে; তাই দেখি বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকগণ জাতিত্ব সম্বন্ধে কি বলছেন। উপাধি বা নাম বা শব্দরূপে যে যাবতীয় পদার্থের স্থিতি-তার বিশ্লেষণই বৈয়াকরণের ক্ষেত্র। আলঙ্কারিকগণ সেই শব্দস্বরূপেরই শক্তি বিচারে শব্দের উপর নানা রঙ্ ফলায়েছেন—তাই তাহারা আলঙ্কারিক। ভাষা বিশ্লেষণে বৈয়াকরণের উপযোগ, তাই তাঁহারা বিশেষ প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য প্রভৃতি নির্দ্দেশ ক'রেছেন যথা জাতি নির্দ্দেশে—'আকৃতি-গ্রহণাজাতি লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্' ইত্যাদি। বস্তুতঃ ঐ সমস্থলে কিজন্য জাতি, দ্রব্য বা গুণ আখ্যা দেওয়া হ'ল বা উহা কি, তার বিশেষ কোন কারণ বা যুক্তি নির্দ্দেশ করা হয় নাই—শুধু

সংজ্ঞা হিসাবে ঐ সব ব্যাকরণে স্থান পেয়েছে। অতএব বৈয়াকরণের নিকট হ'তেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ সহায়তার সম্ভাবনা নাই। এখন আলঙ্কারিক কি বলেন তাই একবার মনোযোগ পূর্ব্বক দেখা যাউক।

কোন একটী শব্দ উচ্চারণ করলে বাচক শব্দে কি বা কোথায় শক্তিগ্রহ হয় তজ্জন্য আলঙ্কারিক বল্‌লেন—

"সাক্ষাৎ সংকেতিতং যোঽর্থমভিধত্তে স বাচকঃ"। অর্থাৎ যে শব্দ যে অর্থ জ্ঞানের প্রকৃষ্ট ভাবে অনুকূল সেই শব্দই সেই অর্থের বাচক। এখন বাচক শব্দ দ্বারা কোথায় কোথায় শক্তিগ্রহ হয় তদুত্তরে বল্‌ছেন—

"সংকেতিতশ্চতুর্ব্বিধোজাত্যাদি র্জাতিরেব বা।" অর্থাৎ বাচক শব্দের শক্তিগ্রহ শুধু উপাধিতে বা জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও নাম বিষয়ে হয়। বিশেষ ক'রে বল্‌বার অভিপ্রায় ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌ছেন,—

উপাধিশ্চ দ্বিবিধঃ, বস্তুধর্ম্মঃ বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিতশ্চ, বস্তুধর্ম্মোঽপি দ্বিবিধঃ, সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধোঽপি দ্বিবিধঃ, **পদার্থস্য প্রাণপ্রদঃ**, বিশেষাধানহেতুশ্চ। তত্রাদ্যো জাতিঃ।

উপাধি দুই প্রকার—বস্তুধর্ম্ম ও বক্তার ইচ্ছানুসারে আরোপিত ধর্ম্ম। বস্তুধর্ম্ম আবার দুই প্রকার সিদ্ধ ও সাধ্য। সিদ্ধ আবার দুই প্রকার, পদার্থের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম আর কোন বিশেষারোপণহেতু ধর্ম্মবিশেষ। এই প্রাণপ্রদ ধর্ম্মই জাতি। বাক্যপদীয়ে বলা হইয়াছে যে গরু বলিলে জাতি-রহিত গোব্যক্তিকে বুঝায় না, কিম্বা গরু ভিন্ন অন্য কিছুও বুঝায় না, কিন্তু গোত্ব অর্থাৎ গরুর যে প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম তাহার সমবায়ের জন্য গরুকেই বুঝায়। এতক্ষণে আমরা যাহা খুঁজ্‌তে ছিলাম তাহার অনেকটা পাওয়া গেল। 'জাতি' বল্‌তে ব্যক্তি বিশেষরই প্রাণ প্রদধর্ম্ম বুঝ্‌তে হ'বে। এখন নরজাতির বা মানব সমূহের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম কি তাহা পেলেই আমাদের বক্তব্য বলা হয়।

আপাতঃদৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে মানবের এই প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল্‌বার হয়ত কিছুই নাই, কেননা গরু, ভেড়া, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি বল্‌লে বা দেখ্‌লে আমাদের যেরূপ একটা সংস্কার বশে ছোটখাটো রকমের এমন একটা ধারণা জন্মায় যে, আমাদের দৈনন্দিন গতাগতিতে কোন প্রকার বাধা না জন্মাইয়া বেশ একভাবে চ'লে যায়, তেমনি মানুষ বল্‌লে বা নরজাতি বল্‌লে আমরা সকলেই ছোটখাটো রকমের একটা ধারণা ক'রে লই; এবং নিজে যখন একটা ঐ জাতীয় জীব, তখন নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যতটা ন্যূনতাই থাক না কেন, মোটের উপর একটা ধারণা সকলেরই আছে। কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপারটী তাহা নয়। ইহা একটু প্রণিধান সহকারে চিন্তা কর্‌লেই দেখা যায় বা অনুভব করা যায়। কতটুকু অনুভব হয়—কতটুকু আমাকে আমি ধরা দিই—কতটুকু আমার স্বরূপ আমার নিকট প্রতিভাত হয়—এ ব্যাপার চির রহস্যময়—এবং আমরা সাধারণ জীব আমাদের নিকট অতি পরম রহস্যময়। স্বরূপের অবগতির জন্য একদল মানুষ প্রতি যুগেই ক্ষেপা হ'য়ে ছুটেছে আর অন্যদল স্বরূপ বিষয়ে চিরদিনই চুপ ক'রে ব'সে আছে। তথাপি এমনি একটী রহস্য আছে যে যতই কোন লোক পার্থিব সুখে বিভোর থাক্ না, জীবনের কোন না কোন মুহূর্ত্তে প্রায় মানবের মধ্যেই অন্ততঃ এই কথাটীর উদয় হয়—কথাটী হচ্ছে—আমি কে—আমার স্বরূপ কি? মানব তাই সকল সময়—সকল অবস্থাতেই—স্বরূপের আলোছায়ায় লুকোচুরি খেল্‌ছে—মায়ামোহের আবরণের ছায়ায় যখন ঢেকে থাকে, তখন সে নিজেকে দেখেও দেখে না; শুনেও শুনে না, জেনেও জানে না। আর, আত্মজ্ঞানের বিমল আলো যখন বিচ্ছুরিত হয়, তখন নবীন আলোকের পুলকে আত্মহারা হ'য়ে স্বরূপে জাতভাবে অর্থাৎ 'আমি কি'—এই জ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ জাগরূক হ'য়ে অবস্থান করে—তখন 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়ঃ।"—হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ স্রোত বইতে থাকে, সমস্ত সংশয় সন্দেহের ঘনঘটা কে'টে যায়—পূর্ণজ্ঞান শশধর হৃদয়াকাশে হাস্‌তে থাকে।

নিতান্ত দেহত্বাভিমানী চার্ব্বাকাদির কথা বাদ দিলে, সমস্ত দর্শনই এই আত্মতত্ব বিচার সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য ও পথ নির্দ্দেশ করে। স্মরণাতীত যুগ হ'তে এ পর্য্যন্ত মানুষ তার আত্মস্বরূপকেই খুঁজে আস্‌ছে—রহস্যের পশ্চাতে পশ্চাতে উধাও হ'য়ে ছুটে চল্‌ছে—ফলে পেয়েছে কি?

—পেয়েছে 'নিজেকে নিজে' আত্মানুভূতি বা Self realisation, আরও একটু রহস্যালোকে এগিয়ে যেয়ে সে ভূমার সন্ধান পেয়ে চির বিস্মিতভাবে, সন্দেহে সঙ্কোচে, ভয় ও ভক্তিতে গদগদ কণ্ঠে চিরতুহিনাবৃত হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌ল—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার স্থামুতেমাং পৃথিবীং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

এই 'কস্মৈ দেবায়' এর ভিতরেই অনন্ত অনুসন্ধিৎসা, অনন্ত বিজিজ্ঞাসা, অনন্ত রহস্য চিরদিন লুকোচুরি খেল্‌ছে। আরও বহুদিন অতীত হ'য়ে গেল। 'যার ব্যথা সেই জানে' এমন যে ব্যথিত, এমন যে পরমদরদী পরম মরমী; সন্দেহ দোলায় দোল খাওয়া জগৎকে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে মোহের ঘনঘটা কে'টে প্রকৃত তত্ত্ব বর্ষণ করে চির পিপাসিত আর্ত্ত মানবকে শান্ত শীতল কর্‌লেন—আজও সেই—নির্ঘোষ কাণে পৌছায়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায়—
জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

এত গেল দেহের কথা—এইখানেই শেষ নয়—আরও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মরমী মরমে পরশ দিয়ে বল্‌ছেন—

অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য অবিকার্য্য বলে কথিত হন। অতএব সারসঙ্কলনে আমরা এই পাই যে দেহ অনিত্য, দেহী নিত্য, দেহ—বিকার্য্য, দেহী—অবিকার্য্য, দেহ—চঞ্চল, দেহী—স্থাণু অর্থাৎ স্থির।

মোটামুটী দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ আমরা কতকটা পেলেম! কিন্তু মানবের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম কি?—তাহা অনেকটা পেলেও এখনও রহস্যময়। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ এই দুইটীই কোন তত্ত্ব নির্দ্ধারণের রীতি বা ধারা, আর অন্বয় ব্যতিরেকই এ সমস্ত স্থলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছবার প্রকৃষ্ট উপায়। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে আমাদের দেহিত্ব অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্মই দেহীর বা জীবের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম! আর দেহ থাকলেই যখন আত্মা থাকে না এবং আত্মা যখন দেহ ছেড়ে অবস্থান করে অর্থাৎ তাহার অবস্থান দেহ নিরপেক্ষ, তখন দেহিত্ব বা আত্মত্বই দেহীর ধর্ম্ম এই স্থির সিদ্ধান্ত।

আত্মত্বই জীব ধর্ম্ম এতক্ষণে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, ভূমার এই বিশ্ব নিকেতন সমস্ত জীবের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম যদি আত্মত্ব হয়, তবে মানব জাতির বৈশিষ্ট্য কোথায়? মানবকে তবে কেন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির স্তরে স্থান দেওয়া হয় না। ইহার গূঢ় রহস্যাবিদ এই রহস্য প্রকটনের জন্যই নর জাতির জাতিত্ব অর্থাৎ প্রাণ প্রদ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেই ইঙ্গিত ক'রে, জগদ্‌গুরু পরম কল্যাণকামী মহাউদ্ধারণ প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দর শ্রীহস্তে তাঁহার স্বরচিত সূত্রগ্রন্থ ত্রিকালগ্রন্থে অমিয়-অক্ষরে লিখ্‌লেন।

"নরজাতি-দেবত্ব"।

আকাশে বাতাসে দিঙ্‌মণ্ডলে নরজাতির তথা মনুষ্যত্বের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিতেই মহাবতারীর মহাবতরণ। শ্রীশ্রীপ্রভু এককথায় কোটীগ্রন্থ শেষ করেছেন। তা তিনি পারেন, কেননা কোটি কোটিতে তার অন্ত হয় না—তাই তিনি অনন্তানন্ত ময়। "যাকে জানায় সেই জানে" তাঁর রহস্য সেই বুঝে তুমি আমি কোন ছার—কোন কীটানুকীট! কি জান্‌বে কি বুঝবে! লীলারস পিপাসু ভক্তগণ, শ্রীশ্রীপ্রভুর অমিয় লেখনীতে কোন্‌ পিযূ ধারা সৃষ্টি হয়েছে—এক কথায় কেমনে কোটী গ্রন্থের সার সঙ্কলন হয়েছে—চিন্তা করুন, অনুধাবন করুন আর মূঢ়চেতা মন্দধী আমিও প্রভু কৃপায় 'তিনি যাহা জানান' তাই জেনে ক্রমশঃ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত কর্‌তে প্রয়াস পাব। ভরসা আছে, তাঁর একমাত্র কৃপা কটাক্ষ, যাহা—

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল বি, এল।

কালীহৈরার কিবা ভাগ্য !

আজ প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি কালীহৈরা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব দর্শন করিতে শ্রীহট্ট, জলসুকা হইতে ঢাকা দক্ষিণ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গনে গিয়াছিলাম। মেলার উদার বদান্যতা, আনন্দ দর্শন এবং রাগময় সঙ্কীর্ত্তনোৎসবগুণে এই ধাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ অথবা অভিন্ন নবদ্বীপ ! শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলোৎসব বাসরের সকালবেলা গৌরানুরাগবিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-সমুদ্র তরঙ্গাবলী ভেদ করিয়া শ্রীঅঙ্গন মাঝে মীনের মত উপনীত হইলাম। মণিপুরী ও বাঙ্গালী নাগরীগণে শ্রীপ্রাঙ্গণ পূর্ণ নিবিড় ! সঙ্কীর্ত্তন পুটিত নামসুধা ও উলু-উলু ধ্বনির মাধুর্য্য প্রবাহে আমি ডুবিলাম। প্রাণের কৌতুহল শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি। ঠাকুর যেন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মেঘের বিদ্যুৎবৎ শ্রীবিগ্রহের চন্দ্রবদন আমার নেত্রে ঝলক লাগাইল। দেখিলাম প্রভু সদ্যঃ তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়াছেন। অধররাগ ও তাম্বুলরাগ মাখিয়া স্মিতসুধা গণ্ডযুগল প্লাবিত করিয়াছে। সেইচন্দ্রবদন মাধুরী চপলার মত ঝলক দিয়া লুকাইল। লোকসংঘট্টে দর্শন ঢাকিয়া গেল। পঞ্চকোষাতীত প্রেমানন্দ সন্দোহ প্রবাহ আমার প্রাণ আকুল করিয়া উর্দ্ধগ হইল। আমি এক অদৃষ্টচর উজ্জ্বল দেশে উঠিয়া গেলাম। আমার ললাট মন্দিরের কপাট সহসা খুলিয়া গেল এবং উহা এক রসপীযূষপূর্ণ কুণ্ডবৎ প্রতীত হইতে থাকিল। তদবধি আমার ললাটদেশ উজ্জ্বল দেখি। এবং তদবধি সেই জ্যোতির্ব্বিন্দু ইন্দুর ন্যায় নানা তত্ত্বসুধা উদ্গীরণ করিতেছে এবং সেই সব নিবন্ধ ও পদাকারে যাবতীয় বৈষ্ণবসেবায় লাগিতেছে।

জাগ্রত সুষুপ্তিতে একবার পরম ভগবানের কৃপায় আমার চিত্ত মণ্ডলে শ্রীশ্রীরাসলীলা প্রকাশ পাইয়াছিলেন। দেখিয়াছিলাম, নীলপীত যুগল যুগল বিরচিত মালায় সেই সকল দিব্যমণি ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই স্বপ্নসুদর্শন প্রথম রাসদর্শন।

আমার ললাটপটস্থ জ্যোতির উৎস হইতে যে সকল তত্ত্বগর্ভ প্রবন্ধ শীকর কণা উদ্ভূত হইয়াছে তন্মধ্যে "মায়ের আশীর্ব্বাদ না দৈববাণী" এক গুরু গম্ভীর সন্দর্ভ। তাহা ক্রমশঃ "শ্রীগৌরাঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছেন। তৎপাঠে কাশিমবাজার শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রথমাধিবেশনে শ্রীবৈষ্ণবগণ পরিবৃত শ্রীগৌড়রাজর্ষি মহারাজ শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতির সাক্ষাতে তদীয় সুযোগ্য সুবিজ্ঞ প্রধান সচিব মনস্বী মহানুভব দাদা আমার ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জ্ঞান গম্ভীর বক্তৃতার একাংশে বলিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকার শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু মহাশয়ের 'মায়ের আশীর্ব্বাদ না দৈববাণী' পাঠে আমি এতদুর বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমি তদবধি কালীহর বাবুকে দেখিবার জন্ম অধীর হইয়াছিলাম।

শ্রীবাসাঙ্গণের সমৃদ্ধিমান শ্রীরাসলীলা "মনসা চিন্তিতা" উক্ত প্রবন্ধ সূত্রে সেবকদের এই প্রথম সম্মিলনীর উপলক্ষিত শ্রীসঙ্কীর্ত্তনে সাক্ষাদ্দর্শন ও আস্বাদন করিয়াছি। এই হইল শ্রীরাসলীলার সাক্ষাদ্দর্শন (প্রথম)। সেই রাসরসের প্রবল তরঙ্গ প্রায় একমাস আনন্দরূপে আমার অঙ্গে খেলিয়াছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় সাক্ষাদ্দর্শন ও সম্ভোগ হইয়াছিল নওয়াখালী, শ্রীধর্ম্মপুর ও দুবেলা চাঁদ গ্রামে। অতঃপর শ্রীরাসরসাস্বাদ ঘটিয়াছিল ময়মনসিংহ, মউহাটি ও পুকুরিয়া গ্রামে (রসের বন্যা বহিয়াছিল)। অতঃপর তাদৃশ ভাগ্য সঞ্চার হইয়াছিল নওয়াখালী, বাবুপুর শ্রীমান তারিণী মোহন ও শ্রীমান নক্ষত্র কুমার মজুমদারের মণ্ডপ গৃহে।

অতঃপর ফরিদপুর, শ্রীঅঙ্গনের কথা।

লাগিলাম। কতদিন প্রভু এই পথ দিয়া বাকচর গিয়াছেন এবং তথা হইতে বদরপুর, ব্রাহ্মণকান্দা এবং গোয়ালচামট ফিরিয়াছেন! কত রজনীতে ভক্তগণ লইয়া এই রাস্তার ধারে যাপন করিয়াছেন! একদিন ভক্তবর গোপাল মিত্রকে সঙ্গে লইয়া নীরব নিশীথে রাস্তার ধারে শস্পবীথিতে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মিত্রজী এইরূপ নির্জ্জনে প্রাণবন্ধুকে পাইয়া তাঁর স্বরূপ তত্ত্বটী অবগত হইবার আশায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "আপনি কে?" ভক্তের কাছে তখন প্রভু নিজের কথা বলিতেছেন,—"আমি কেহ নহি, একটী চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে সব লক্ষণ ছিল তাহা আমাতে আছে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সব লক্ষণ ছিল তাহাও আমাতে আছে। অমুকের (শ্রীরাধার) যে সব লক্ষণ ছিল তাহাও আমাতে আছে। তোরা দেখ্‌বি কি? তোরা কি চিন্‌তে পারিস্? আমার রাজটীকা আছে। উনিশটী লক্ষণ আছে।" আর একদিন শ্রীধাম বাকচর হইতে মৌনাবলম্বনের কিছু পূর্ব্বে বঙ্কু সাহা মহাশয়ের সঙ্গে গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে আসিতেছেন। ঐদিন নিম্নোক্ত ভাবের তত্ত্বকথাগুলি তাহাকে শুনাইতে শুনাইতে আসিতেছিলেন:—"আমাকে ত কেউ চিন্‌ল না। আমি জীবের উদ্ধারের জন্য এসেছি। আমাকে সেই হরি বলিয়া জানিও। তোদের মহাপ্রভু ছিল পৌণে চার হাত, আমি চার হাত। আমার হাত কেউ এড়াতে পারবে না। যে যেদিক্ দিয়াই যাক্ না কেন, আমার কাছে আস্‌তে হবে। ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি ডুরি আমার হাতের মধ্যেই আছে।" শুনিয়াছি, অন্য একদিন ভক্তগণ সহ এই রাস্তার পাশে বসিয়াই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "কালে এমন একদিন আস্‌বে, যখন এখানে বড় বড় ষ্টীমার সকল নোঙ্গর ক'রে থাকবে।" ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যে সবই হইতে পারে। সুতরাং ওখানে একদিন ষ্টীমার নোঙ্গর করিবে এ আর অধিক বিচিত্র কি? অন্য একদিন বালক ভক্তগণ সহ নৈশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এইখানে আসিয়াছেন। আসিয়াই অদূরের একটী বাব্‌লা গাছ ঘিরিয়া সকলকে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তখন ঝড়বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও মর্ মর্ শব্দ এবং ঝুপ ঝাপ বৃষ্টি পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া প্রভুর কাছে ছুটিয়া আসিলে, রজিয়া বন্ধুসুন্দর বলিয়াছিলেন, "গান বন্ধ না করলে একটী মহাত্মার দর্শন পেতিস্। * * তোদের মুখে হরিনাম শুনে তিনি মুক্ত হলেন।" এই সমস্ত স্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে মহানাম রোলে চতুর্দ্দিক আলোড়িত করিয়া আমরা পথ চলিতেছি। ওদিকে দিনমণি আবির রাঙা রঙ্ ছড়াইয়া অস্তাচলে ডুবুডুবু হইতেছেন। যখন বন্ধুহরি ছায়াতল অতিক্রম করিয়া যাইতেন তখন এই পথের তরুরাজি আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিত। বহুদিন যাবৎ প্রাণের দেবতার অদর্শনে তাহারা কেন বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়াছে। আমরা পরাণপুরের কাছে যাইতেই সন্ধ্যা ঘোর হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীশ্রী প্রভু ত্রিকাল গ্রন্থে এই পরাণপুরকে 'সিন্ধুরা' আখ্যা দিয়াছেন। কালের কুটিলা গতিতে আজ যেখানে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ কাল সেখানে তরঙ্গায়িত বিশাল সমুদ্র। আজ যে পরাণপুর আমরা অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, মহাউদ্ধারণ মহালীলা অভিনয়ের দিনে সেখানে যে প্লাবন আসিবে তাহা কল্পনা করিতেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই পরাণপুরেই বন্ধুরাঘবের গুহক চণ্ডাল জন্মেজয়ের বাস ছিল। 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ' বাণীটার সার্থকতা তিনি তাহার জীবনে বর্ণে বর্ণে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁর নিয়ম নিষ্ঠা সদাচরণ, প্রেমভক্তিতে দ্বিজ কুলও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এমন কি পবিত্রতার বিকাশে তার অঙ্গ হইতে একটা দিব্য গন্ধও বহির্গত হইত। বনফুলের মতই তিনি একদিন এই গ্রামটিকে পরম শোভিত রাখিয়াছিলেন। ইহার ভ্রাতৃগণ আজও আছেন। এই পরাণপুরের একটি পরমা ভক্তিমতী মা আছেন। ভক্ত দেখিলেই মা পুত্র বাৎসল্যে সকলকে আপ্যায়িত করেন। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার আজ বন্ধু সেবার আনন্দে কাল কাটাইতেছেন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ দাসের (ভুবন মোহন ঘোষ) ভ্রাতা মতিলাল ঘোষ প্রথমে এখানে সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং চতুপার্শ্বের নরনারীকে বন্ধু নামে মাতোয়ারা করিয়া তোলেন। ইনি নিষ্ঠাবান পরম ভক্ত ছিলেন। বহুদিন হইল ইনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন। বাকচরের রাখাল এখানেই প্রথম প্রভুর কৃপা লাভ করেন। একদিন তিনি নৌকা যোগে দূর হইতে শ্রীশ্রী প্রভুর শরদিন্দু-

নিভ পাদপদ্ম এবং নিরুপম কান্তি চন্দ্রবদনের কিয়দংশ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা ক্রমে ঐ মাতার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীশ্রীপ্রভুর মন্দিরের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। তথা হইতে আমরা বন্ধুগত প্রাণ বিপিন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর উপর দিয়া বাকচর যাত্রা করিলাম। শ্রীশ্রী প্রভুর নির্দ্দেশিত পূতঃ সলিলা কাবেরীর তীর দিয়াই পথ। ধীর মন্থর গতিতে কাবেরী রাণী বন্ধু মাণিকের বিরহে মুহ্যমানা হইয়াই যেন কুলু কুলু রবে আর্ত্তনাদ করিয়া ঐ শ্রীঅঙ্গন অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কতদিন প্রভু বাকচরের ঘাট হইতে ডুব দিয়া এখানে আসিয়া উঠিয়াছেন। কতদিন প্রভু এই কাবেরীর অতল কোলে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া ভক্তগণকে দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছেন। কালীহ্রদ নিমজ্জিত কালাচাঁদের অদর্শনে যেমন ব্রজ রাখালগণ একদিন আকুল হইয়া উঠিতেন, নব-ব্রজধাম বাকচরের রাখাল ভক্তগণও তেমি প্রভুকে না দেখিয়া অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। ক্রমে আমরা শ্রীধাম বাকচর শ্রীঅঙ্গনের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরেকৃষ্ণ বন্ধুদাস।

মহাধর্ম্ম মীমাংসা।

কোন বই পড়িতে হইলে, খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেই হয়, কিন্তু আমার প্রভুর কোন লেখা পড়িতে হইলে সে লেখার নাম (heading) হইতে পড়িতে হয়। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যেমন নাম ও নামী অভেদ, তাঁহার গ্রন্থের নামের সঙ্গেও তৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রায় তেমন ধারা একটা অভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীপ্রভুর রচিত গ্রন্থ মধ্যে পাঁচখানি প্রধান—হরিকথা, চন্দ্রপাত, ত্রিকাল গ্রন্থ, উদ্ধারণ ও শ্রীমতী সংকীর্ত্তন। এই প্রত্যেকটী নামকরণের মধ্যেও একটী রহস্য নিহিত আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে যথামতি তাহা আস্বাদন করিব। প্রথমতঃ ত্রিকাল গ্রন্থের নাম-করণ আলোচনীয়।

বর্ত্তমানে বহু বান্ধব এই সকল গ্রন্থরাজি লইয়া প্রাণপণ আলোচনা ও অর্থনিষ্কাশনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা পরমানন্দের ও শ্লাঘার বিষয়, এই সকল ব্যাখ্যা কারিদের মধ্যে স্বনামধন্য পণ্ডিতকুলচূড়ামণি শ্রীল দামোদর লালাজীর নাম অন্যতম, তিনি শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থের একটী ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, তা ছাড়া অনেক ভক্ত চন্দ্রপাত ও ত্রিকালের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন তবে কেহই এ পর্য্যন্ত মুদ্রন সম্পাদন করিয়া প্রচারে সাহস করেন নাই। 'এই ব্যাখ্যাই ঠিক কিনা' নিজ নিজ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সকলেই এরূপ সন্দিহান আছেন। আর সেইরূপ সন্দেহ থাকাই উচিত। ভক্তের কোন রচনার উপর টীকা ব্যাখ্যা করা আলাদা কথা, কিন্তু স্বয়ং প্রভুর লেখনীর উপর কোন ব্যাখ্যা করিবার সময় সকলেরই মনে রাখা উচিত—আমি ব্যাখ্যা করিতেছি না—ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

"ত্রিকাল গ্রন্থ" এই নাম সম্বন্ধে কেহ কেহ মনে করেন ত্রিকালের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম ত্রিকাল গ্রন্থ। এই ব্যাখ্যা বেশ সহজ, সাদাসিধে, কিন্তু সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একটু চিন্তা করিতে হয়, যে পৃথিবীতে লক্ষ কোটী গ্রন্থ আছে, কোনও গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'গ্রন্থ' এই পদটী যুক্ত নাই ভাগবতের নাম ভাগবত গ্রন্থ নহে, শ্রীচরিতামৃতের নাম শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ নহে, হরিকথার নাম হরিকথা গ্রন্থ নহে, গ্রন্থের নামের সঙ্গে পুনরায় গ্রন্থপদ যোগকরার কি কোনও তাৎপর্য্য নাই? নাই বলিলে বিলক্ষণ; প্রভু বৃথাই ঐ অক্ষরদুটী প্রয়োগ করিয়াছেন। আর আছে বলিলেই ভাবিতে হইবে।

আমরা নাই বলিতে রাজী নহি। তবে কি অর্থে ঐ পদটী দিয়াছেন তাহাই অনুধাবনীয়। প্রথমসূত্র—"ত্রিকাল ফক্কিকার" আলোচনা করিলেই ত্রিকাল পদের অর্থ বাহির হইতে পারে। হইলে পরে ত্রিকাল গ্রন্থ নামকরণ রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস পাইব।

কেহ কেহ মনে করেন, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ হইতে কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত কালকে ত্রিকাল কহে, কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না,—কারণ ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই তিনটীকেই কেহ কাল আখ্যা দেন না—ত্রেতা কাল, দ্বাপর কাল, এরূপ কোথাও পাইনা—যুগ শব্দের সঙ্গেই তাহারা নিত্য সম্বদ্ধ। কেবল কলির সঙ্গে কাল শব্দটীর মিল হওয়ার কারণ—অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে, সত্য শব্দের সঙ্গে কাল শব্দের মিল থাকিলেও তাহাকে ত পরিবর্জ্জনই করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যেমন বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ভেদে মানব জাতিকে ভাগ করা উচিত নহে; তদ্রূপ ত্রেতাদি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা লইয়া কাল বিভাজ্য নহে।

যুগ ও কাল যদি একার্থক বলিয়া ত্রেতাদিকে কালই ধরিয়া লই, তথাপি সত্যকে বাদ দিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না, বরং সত্যকে বাদ দেওয়া অন্ধতার পরিচায়ক। কারণ চক্ষু খুলিয়া ত্রিকাল গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা দেখিলেই বড় অক্ষরে সত্যযুগ শীর্ষক বহুসূত্র পরিদৃষ্ট হয়। যে ত্রিকালের বর্ণনার জন্য গ্রন্থের নাম ত্রিকাল গ্রন্থ হইয়াছে, সেই ত্রিকালের অর্থ যদি ত্রেতা দ্বাপর কলি হয় তবে ত্রিকাল গ্রন্থ হইতে ঐ অংশ বাদ দিতে হয়। এইরূপ বাদ দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই।

ত্রিকাল পদে ত্রেতাদি যুগ বলিয়া ফক্কিকার অর্থে ফাঁকি বুঝিলে ত্রেতাদি কালকে মিথ্যা বলা হয়, কিন্তু কোন শাস্ত্রে বা প্রভুর লেখনীতে তাদৃশ ভাব পরিলক্ষিত হয় না। ত্রেতাদি যুগ ও তৎতৎ যুগের বর্ণনীয় বিষয় যদি মিথ্যাই হয়, তবে শাস্ত্রের অনেক তত্ত্বকে অস্বীকার করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ কলিকে মিথ্যা ত বলেনই নাই, বরং 'ধন্য কলি শত ধন্য' বলিয়াছেন। "সত্য যুগে ছিলেন হরি" এই পর্য্যন্তই পাই কিন্তু তাৎকালীন কোন বর্ণনা পাই না। 'ত্রেতায় রাম ধনুকধারী' হইতেই এ পর্য্যন্ত পুরাণ শাস্ত্র যা কিছু পাইয়াছি সব ফাঁকি বা অসত্য বলিবার মত সাহস আমার নাই।

ত্রিকাল এই পদটীর গর্ভে দুইটী শব্দ আছে। শব্দ দুইটী বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে সম্বদ্ধ। ত্রি বিশেষণ, কাল বিশেষ্য ইহার সমাস বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। 'ফক্কিকার' আর একটী বিশেষণ। এই বিশেষণটী কাহার? আপাততঃ মনে হয়, কাল এই বিশেষ্যেরই বিশেষণ এবং সেইরূপ মনে করিয়াই ত্রেতা দ্বাপর, কলি এই তিনকাল ফক্কিকার বা ফাঁকি এরূপ অর্থ করা যায়, বস্তুতঃ তাহা নহে। ত্রিকাল দুইটী পদ হইলেও এক পদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ফক্কিকার এই বিশেষণ কালের উপর না পড়িয়া ত্রি এই বিশেষণের উপর পড়িবে। বিশেষণ যুক্ত কোন বস্তুর নিষেধ বা গ্রহণ হইলে মুখ্যতঃ বিশেষণেরই গ্রহণ হয় বিশেষ্যের নহে। যদি বলি কীর্ত্তনে ভাল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন না তবে কি বোঝা যায় যে মোটেই কীর্ত্তনীয়া ছিলেন না, নাকি কীর্ত্তনীয়া ছিলেন—তিনি ভাল ছিলেন না। যদি বলি, তিন খানা খোল নাই, তবে কি বুঝিব যে খোল মাত্র নাই—নাকি খোল আছে, কিন্তু সংখ্যায় তিন খানি নাই। ফক্কিকার অর্থ অসত্য হইলে তাহা দ্বারা কালের ত্রিসংখ্যাত্বের অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কালের অসত্যত্ব গ্রাহ্য হয় না বরং তাহার সত্যতাই উদ্দিষ্ট হয়, যেমন তিনখানি খোল নাই বলিবে খোল আছে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না তদ্রূপ ত্রিকাল ফক্কিকার বলিলে কাল যে ফক্কিকার নহে তাহার ত্রিত্বই ফক্কিকার ইহাই বুঝিতে হয়। যাহা হউক, এতাবতা আমরা প্রভুর সূত্র হইতেই পাইলাম;—

কাল ধর্ম্মী তাহা অসত্য নহে। তাহাতে আরোপিত ত্রিত্ব নামক যে একটি ধর্ম্ম তাহাই ফাঁকি।—এই কাল কি তাহা বুঝিতে হইবে তাহার ত্রিত্ব কি তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে ফক্কিকার কথাটির তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক।

'ফক্কিকা' একটি সংস্কৃত শব্দ তাহা ফাঁকি অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ শব্দটি বিশেষ্য। প্রভু বোধ হয় 'র' প্রত্যয়টি যোগ করিয়া তাহা বিশেষণ ভাবাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ফক্কিকার অর্থ কেবল ফাঁকি বা ভ্রম বুঝিলে ই কার্য্য উদ্ধার

হইবে না। ভ্রম জ্ঞান দ্বিবিধ বস্তুতে বস্তু ভ্রম আর অবস্তুতে বস্তু ভ্রম। একগাছি রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া ভ্রম হইল, ইহা বস্তুতে বস্তুভ্রম। ইংরেজি শাস্ত্রে বলে Ilusion, কখনও এমন হয় যে আমার চোখের সামনে কিছুই নাই তবু যেন দেখিতেছি একটা ভূত দাঁড়াইয়া আছে। ইহা অবস্তুতে বস্তুভ্রম—ইংরেজীতে বলে Hallucination. এই যে কালের ত্রিত্ববুদ্ধি ইহা যদি ফাঁকি বা ভ্রমজ্ঞানজাত হয় তবে ইহা কোন জাতীয় ভ্রম। কালেতে কি একত্ব বা ত্রিত্ব কোনরূপ ধর্ম্ম আছে যেখানে ত্রিত্বের ভ্রম হইতেছে, নাকি কোন ধর্ম্ম নাই। অকারণ ঐরূপ একটা ভুল হইতেছে। আমরা দেখি বস্তু মাত্রেরই সংখ্যা আছে অলীকবস্তু বাদে সর্ব্বত্রই সংখ্যাত্ব বিরাজমান। শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন "কৃষ্ণ একলেশ্বর" অন্যত্র বলিয়াছেন "আমি একক।" ইহা হইতে আমরা পাই পরম বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ বা তিনি স্বয়ং, তাঁহাতেও একত্বরূপ সংখ্যা আছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে শ্রীশ্রীপ্রভু কালকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা হইলে সংখ্যাত্ব রূপ বস্তুধর্ম্ম কালেতে আছেই। এখন ত্রিত্ব পদে যদি বহুত্ব লক্ষণা করি তবে কার্য্যতঃ কালের একত্ব সিদ্ধ হয় আর ত্রিত্বের যদি লক্ষ্যার্থ অস্বীকার করিয়া বাচ্যার্থই লই তথাপি ত্রিত্বাদির সমর্থক কোন সৎ হেতু না থাকায় ফলতঃ একত্ব সিদ্ধ হয়।

অতএব প্রভুর সূত্র হইতেই আমরা অর্থ পাইলাম,—যে একত্ব সংখ্যা বিশিষ্ট কাল নামক যে একটি সদ্বস্তু তাহার যে ত্রৈবিধ্য তাহা ভ্রম বিশেষ। এস্থলে আর একটি কথা এই যে সংখ্যার জ্ঞানটাই অপেক্ষা বুদ্ধি জাত। এই যে আপনার হাতে দুইখানি করতাল রহিয়াছে এই দ্বিত্ব সংখ্যা ঐ করতালজোড়াতে রহিয়াছে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে মনে করি যে এই যে করতালের দ্বিত্ব ইহা আমার হাতে থাকিলেও থাকিবে, না থাকিলেও থাকিবে। কিন্তু দর্শন যাহাদের দর্শনইন্দ্রিয় তাহারা সে কথা বলেন না, তাহারা বলেন যে যখন কোন দর্শক জানিতেছে যে এই একহাতে একখানি করতাল আর এই আর এক হাতে একখানি করতাল—ঠিক তখনই এখানে দুইখানি করতাল যদি পৃথিবীতে ঐরূপ অপেক্ষা বুদ্ধি বিশিষ্ট কোন জীব না থাকিত তবে ঐ করতালের উপর দ্বিত্ব সংখ্যা থাকিতে পারিত না।

এখন আমাদের কালেতে আমরা দুইটি সংখ্যা পাইতেছি একটি একত্ব তাহা সত্য, আর একটি ত্রিত্ব তাহা মিথ্যা। আমাকে এখন দুইজন বুদ্ধি বিশিষ্ট দর্শক স্বীকার করিতে হইবে। একজন কালকে 'এক' বলিয়া ঠিক ঠিক জানিতেছেন—আর একজন তিন বলিয়া ভুল জানিতেছে। এখন এই দুইজন কে? আর ঐ তিনই বা কি? আমরা দেখাইয়াছি সে ত্রিত্ব ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগাত্মক নহে। তবে তাহা কি? শ্রীশ্রীবন্ধু বান্ধববর্গের করুণা সম্বল করিয়া ক্রমে আস্বাদন করিবার আশায় থাকিলাম॥

(ক্রমশঃ)

মহানামব্রত।

"নরজাতি দেবত্ব"

'ত্রিকাল গ্রন্থ'

আজকাল 'স্বজাতির উন্নতিবিধান,' জাতীয় আন্দোলন, 'জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সরকারী পদপ্রাপ্তি' 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রভৃতি ব্যাপারে জাতি কথাটার উপরে সকলেরই বেশ একটু নজর প'ড়েছে। সমাজহিতৈষী উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতামঞ্চ কাঁপাইয়া বল্‌ছেন—"ভাই সব, আর কতকাল মোহনিদ্রায় থাকবে, একবার উঠ, জাগো—নিজের জাতির দিকে তাকাও, দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন কর।" স্বদেশহিতৈষী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে এই নীতি দেশে প্রচার কর্‌ছেন—"ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, হিংসা দ্বেষ ছাড়, একত্র হও, দেশের গৌরব বৃদ্ধি কর।"

সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লবী চোখ,রাঙাইয়া, যত দোষ সব পূর্ব্বপুরুষের উপর দিয়া আজ সমস্ত মানবকে মহাসম্মেলনের পুণ্যক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত। আর সর্ব্বোপরি বিশ্বপ্রেমিক তার বিশ্ববিমোহন প্রেমের মুরলী নিনাদে হিংসা-দ্বেষ-কলহ দগ্ধ শান্তিপিপাসু মানবকুলকে মোহনিদ্রার মোহ ভাঙাইয়া—আত্মস্বরূপবোধের জন্যই যেন পুনঃ পুনঃ বল্‌ছেন—"শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

জাতির গোড়ার কথার আলোচনায় নানালোকে নানা কথা বল্‌বেন—কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল সম্ভবপর নয়—কেন না প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক্ হ'তে এই 'জাতিকে' দেখ্‌ছেন। তাই বর্ত্তমানে সমস্যা এই যে জাতির বাস্তবিক নিত্য স্থায়ী কোন স্বরূপ আছে—না ও জিনিষটা একটা কথার কথা বা ভুয়ো জিনিষ। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের দিকে তাকাইলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে তিনি অসংখ্য জীবজন্তু কীট পতঙ্গ ও বৃক্ষলতাদি সৃষ্টি ক'রে তাঁর লীলাময় নাম সার্থক করেছেন। এখন সৃষ্ট জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রত্যেকেই এক একটা জাতি বা শ্রেণী এই হিসাবে উল্লিখিত জাতিগুলি হ'তে আবার বহু প্রকার জাতি বা শ্রেণী ভাগ করা যায়। প্রাণিগণের ভিতর এইরূপ ভাবে মানুষ বা নর এক জাতি, এই নরজাতিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

দেশ হিসাবে—ইংরেজ, ফরাসী, জাপান প্রভৃতি, ধর্ম্মহিসাবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি, কর্ম্ম হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি, সকলেই বস্তুতঃ সেই বিশাল নরজাতিরই শাখা প্রশাখা। আর বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ও কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে এই সাধারণ বিশাল মানবজাতি বা মানবসমষ্টিকে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হ'য়েছে। কিন্তু উল্লিখিত যে সব বিভাগের কথা বলা হ'য়েছে তাহা বিশাল মানবজাতির অন্তর্বিভাগ বা আভ্যন্তরীণ ভাগবিচয়। ইতিহাস ভূগোল বা সামাজিক গ্রন্থাদি হ'তে ঐ সমস্ত ভাগগুলি যথাযথ বা সম্যক্‌ভাবে জানা যেতে পারে, তজ্জন্য ঐ সমস্ত বিভাগের কথাও বলার এখানে প্রয়োজন নাই বলিলেও চলে।

আমাদের আলোচ্যবিষয় বহির্বিভাগ। এখন এই বহির্বিভাগটী কি তাই আমাদের অনুসন্ধান করতে হ'বে। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরুলতা প্রভৃতি ল'য়ে এই আশ্চর্য্য পরিদৃশ্যমান জগৎ। এখানে এই নরজাতিকে 'নরজাতি' কেন বলা হয় অর্থাৎ কোন্ বৈশিষ্ট্যদ্বারা ইহা অন্যান্য জীব ও জড় জগত হ'তে পরিচ্ছিন্ন তাহাই আমাদের দেখ্‌তে হবে। যেমন গলকম্বলাদি বিশিষ্ট পশুকে গরু নামে আখ্যা দেওয়া হয় তেমনি এই মানবের সকল জীবের ও জড়ের ক্ষেত্রে কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে মানব 'নরজাতি' এই উপাধি পাইতে পারে।

এ তত্ত্বালোচনায় নানাবিধ গুরুজ নানা উপায়ে নানা যন্ত্রাদি প্রয়োগে 'নর'কে হয়ত বিশ্লেষণ করে দেখছেন বা দেখ্‌তে পারেন। অসম্ভব-সম্ভবকারী, অঘটন-ঘটন যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিকগণ তাদের যন্ত্রাদি ল'য়ে নরকে বিশ্লেষণ করতে বস্‌লেন। বিশ্লেষণ (analysis) ও সংশ্লেষণ (Synthesis) এই দুইটী বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র বা উপায়। বিশ্লেষণে যাহার স্বরূপ ধরা-পড়েনা এবং সংশ্লেষণেও যাহার উৎপত্তি নির্ণীত হয় না—তাহা একরূপ বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বাইরে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষু ল'য়ে যদি অগ্রসর হই, তবে হয় ত নরের জীবন মরণ রহস্যেরও খানিকটা জানবার সুযোগ হ'বে. কিন্তু 'নরজাতির' জাতিত্ব যে কি তাহা জানবার বিশেষ সুবিধা নাই।

বৈয়াকরণ বা আলঙ্কারিকের চক্ষু ল'য়ে দেখ্‌তে প্রয়াস পাইলে হয়ত একটু সুবিধা হ'তে পারে; তাই দেখি বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকগণ জাতিত্ব সম্বন্ধে কি বল্‌ছেন। উপাধি বা নাম বা শব্দরূপে যে যাবতীয় পদার্থের স্থিতি-তার বিশ্লেষণই বৈয়াকরণের ক্ষেত্র। আলঙ্কারিকগণ সেই শব্দস্বরূপেরই শক্তি বিচারে শব্দের উপর নানা রঙ্ ফলায়েছেন—তাই তাহারা আলঙ্কারিক। ভাষা বিশ্লেষণে বৈয়াকরণের উপযোগ, তাই তাঁহারা বিশেষ প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য প্রভৃতি নির্দ্দেশ ক'রেছেন যথা জাতি নির্দ্দেশে—'আকৃতি-গ্রহণাজাতি লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্' ইত্যাদি। বস্তুতঃ ঐ সকলে কিজন্য জাতি, দ্রব্য বা গুণ আখ্যা দেওয়া হ'ল বা উহা কি, তার বিশেষ কোন কারণ বা যুক্তি নির্দ্দেশ করা হয় নাই—শুধু

সংজ্ঞা হিসাবে ঐ সব ব্যাকরণে স্থান পেয়েছে। অতএব বৈয়াকরণের নিকট হ'তেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিশেষ সহায়তার সম্ভাবনা নাই। এখন আলঙ্কারিক কি বলেন তাই একবার মনোযোগ পূর্ব্বক দেখা যাউক।

কোন একটী শব্দ উচ্চারণ করলে বাচক শব্দে কি বা কোথায় শক্তিগ্রহ হয় তজ্জন্য আলঙ্কারিক বল্লেন—

"সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং যোঽর্থমভিধত্তে স বাচকঃ"। অর্থাৎ যে শব্দ যে অর্থ জ্ঞানের প্রকৃষ্ট ভাবে অনুকূল সেই শব্দই সেই অর্থের বাচক। এখন বাচক শব্দ দ্বারা কোথায় কোথায় শক্তিগ্রহ হয় তদুত্তরে বল্ছেন—

"সঙ্কেতিতশ্চতুর্ব্বিধো জাত্যাদি র্জাতিরেব বা।" অর্থাৎ বাচক শব্দের শক্তিগ্রহ শুধু উপাধিতে বা জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও নাম বিষয়ে হয়। বিশেষ ক'রে বল্বার অভিপ্রায় ব্যাখ্যা ক'রে বল্ছেন,—

উপাধিশ্চ দ্বিবিধঃ, বস্তুধর্ম্মঃ বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিতশ্চ, বস্তুধর্ম্মোঽপি দ্বিবিধঃ, সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধোঽপি দ্বিবিধঃ, **পদার্থস্য প্রাণপ্রদঃ**, বিশেষাধানহেতুশ্চ। তত্রাদ্যো জাতিঃ।

উপাধি দুই প্রকার—বস্তুধর্ম্ম ও বক্তার ইচ্ছানুসারে আরোপিত ধর্ম্ম। বস্তুধর্ম্ম আবার দুই প্রকার সিদ্ধ ও সাধ্য। সিদ্ধ আবার দুই প্রকার, পদার্থের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম আর কোন বিশেষারোপণহেতু ধর্ম্মবিশেষ। এই প্রাণপ্রদ ধর্ম্মই জাতি। বাক্যপদীয়ে বলা হইয়াছে যে গরু বলিলে জাতি-রহিত গোব্যক্তিকে বুঝায় না, কিম্বা গরু ভিন্ন অন্য কিছুও বুঝায় না, কিন্তু গোত্ব অর্থাৎ গরুর যে প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম তাহার সমবায়ের জন্য গরুকেই বুঝায়। এতক্ষণে আমরা যাহা খুঁজ্তে ছিলাম তাহার অনেকটা পাওয়া গেল। 'জাতি' বল্তে ব্যক্তি বিশেষেরই প্রাণ প্রদধর্ম্ম বুঝ্তে হ'বে। এখন নরজাতির বা মানব সমূহের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম কি তাহা পেলেই আমাদের বক্তব্য বলা হয়।

আপাতঃদৃষ্টিতে দেখ্তে গেলে মানবের এই প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বল্বার হয়ত কিছুই নাই, কেননা গরু, ভেড়া, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি বল্লে বা দেখ্লে আমাদের যেরূপ একটা সংস্কার বশে ছোটখাটো রকমের এমন একটা ধারণা জন্মায় যে, আমাদের দৈনন্দিন গতাগতিতে কোন প্রকার বাধা না জন্মাইয়া বেশ একভাবে চ'লে যায়, তেমনি মানুষ বল্লে বা নরজাতি বল্লে আমরা সকলেই ছোটখাটো রকমের একটা ধারণা ক'রে লই; এবং নিজে যখন একটা ঐ জাতীয় জীব, তখন নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যতটা ন্যূনতাই থাক না কেন, মোটের উপর একটা ধারণা সকলেরই আছে। কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপারটী তাহা নয়। ইহা একটু প্রণিধান সহকারে চিন্তা করলেই দেখা যায় বা অনুভব করা যায়। কতটুকু অনুভব হয়—কতটুকু আমাকে আমি ধরা দিই—কতটুকু আমার স্বরূপ আমার নিকট প্রতিভাত হয়—এ ব্যাপার চির রহস্যময়—এবং আমরা সাধারণ জীব আমাদের নিকট অতি পরম রহস্যময়। স্বরূপের অবগতির জন্য একদল মানুষ প্রতি যুগেই ক্ষেপা হ'য়ে ছুটেছে আর অন্যদল স্বরূপ বিষয়ে চিরদিনই চুপ ক'রে ব'সে আছে। তথাপি এমনি একটী রহস্য আছে যে যতই কোন লোক পার্থিব সুখে বিভোর থাক্ না, জীবনের কোন না কোন মুহূর্ত্তে প্রায় মানবের মধ্যেই অন্ততঃ এই কথাটীর উদয় হয়—কথাটী হচ্ছে—আমি কে—আমার স্বরূপ কি? মানব তাই সকল সময়—সকল অবস্থাতেই—স্বরূপের আলোছায়ায় লুকোচুরি খেল্ছে—মায়ামোহের আবরণের ছায়ায় যখন ঢেকে থাকে, তখন সে নিজেকে দেখেও দেখে না; শুনেও শুনে না, জেনেও জানে না। আর, আত্মজ্ঞানের বিমল আলো যখন বিচ্ছুরিত হয়, তখন নবীন আলোকের পুলকে আত্মহারা হ'য়ে স্বরূপে জাতভাবে অর্থাৎ 'আমি কি'—এই জ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ জাগরূক হ'য়ে অবস্থান করে—তখন 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়ঃ।'—হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ স্রোত বইতে থাকে, সমস্ত সংশয় সন্দেহের ঘনঘটা কে'টে যায়—পূর্ণজ্ঞান শশধর হৃদয়াকাশে হাস্তে থাকে।

নিতান্ত দেহাত্মাভিমানী চার্ব্বাকাদির কথা বাদ দিলে, সমস্ত দর্শনই এই আত্মতত্ত্ব বিচার সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য ও পথ নির্দ্দেশ করে। স্মরণাতীত যুগ হ'তে এ পর্য্যন্ত মানুষ তার আত্মস্বরূপকেই খুঁজে আস্ছে—রহস্যের পশ্চাতে পশ্চাতে উধাও হ'য়ে ছুটে চল্ছে—ফলে পেয়েছে কি?

—পেয়েছে 'নিজেকে নিজে' আত্মানুভূতি বা Self realisation, আরও একটু রহস্যালোকে এগিয়ে যেয়ে সে ভূমার সন্ধান পেয়ে চির বিস্মিতভাবে, সন্দেহে সঙ্কোচে, ভয় ও ভক্তিতে গদগদ কণ্ঠে চিরতুহিনাবৃত হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌ল—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার প্থামুতেমাং পৃথিবীং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

এই 'কস্মৈ দেবায়' এর ভিতরেই অনন্ত অনুসন্ধিৎসা, অনন্ত বিজিজ্ঞাসা, অনন্ত রহস্য চিরদিন লুকোচুরি খেল্‌ছে। আরও বহুদিন অতীত হ'য়ে গেল। 'যার ব্যথা সেই জানে' এমন যে ব্যথিত, এমন যে পরমদরদী পরম মরমী; সন্দেহ দোলায় দোল খাওয়া জগৎকে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে মোহের ঘনঘটা কে'টে প্রকৃত তত্ত্ব বর্ষণ করে চির পিপাসিত আর্ত্ত মানবকে শান্ত শীতল কর্‌লেন—আজও সেই—নির্ঘোষ কাণে পৌছায়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায়—
জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

এত গেল দেহের কথা—এইখানেই শেষ নয়—আরও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মরমী মরমে পরশ দিয়ে বল্‌ছেন—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য অবিকার্য্য বলে কথিত হন। অতএব সারসঙ্কলনে আমরা এই পাই যে দেহ অনিত্য, দেহী নিত্য, দেহ—বিকার্য্য, দেহী —অবিকার্য্য, দেহ—চঞ্চল, দেহী—স্থাণু অর্থাৎ স্থির।

মোটামুটী দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ আমরা কতকটা পেলেম! কিন্তু মানবের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম কি?—তাহা অনেকটা পেলেও এখনও রহস্যময়। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ এই দুইটীই কোন তত্ত্ব নির্দ্ধারণের রীতি বা ধারা, আর অন্বয় ব্যতিরেকই এ সমস্ত স্থলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছবার প্রকৃষ্ট উপায়। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে আমাদের দেহিত্ব অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্মই দেহীর বা জীবের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম! আর দেহ থাক্‌লেই যখন আত্মা থাকে না এবং আত্মা যখন দেহ ছেড়ে অবস্থান করে অর্থাৎ তাহার অবস্থান দেহ নিরপেক্ষ, তখন দেহিত্ব বা আত্মত্বই দেহীর ধর্ম্ম এই স্থির সিদ্ধান্ত।

আত্মত্বই জীব ধর্ম্ম এতক্ষণে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, ভূমার এই বিশ্ব নিকেতন সমস্ত জীবের প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম যদি আত্মত্ব হয়, তবে মানব জাতির বৈশিষ্ট্য কোথায়? মানবকে তবে কেন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির স্তরে স্থান দেওয়া হয় না। ইহার গূঢ় রহস্যবিদ এই রহস্য প্রকটনের জন্যই নর জাতির জাতিত্ব অর্থাৎ প্রাণপ্রদ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেই ইঙ্গিত ক'রে, জগদ্‌গুরু পরম কল্যাণকামী মহাউদ্ধারণ প্রভু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর শ্রীহস্তে তাঁহার স্বরচিত সূত্রগ্রন্থ ত্রিকালগ্রন্থে অমিয়-অক্ষরে লিখ্‌লেন।

"নরজাতি-দেবত্ব"।

আকাশে বাতাসে দিঙ্‌মণ্ডলে নরজাতির তথা মনুষ্যত্বের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিতেই মহাবতারীর মহাবতরণ। শ্রীশ্রীপ্রভু এককথায় কোটীগ্রন্থ শেষ করেছেন। তা তিনি পারেন, কেননা কোটি কোটিতে তার অন্ত হয় না—তাই তিনি অনন্তানন্ত ময়। "যাকে জানায় সেই জানে" তাঁর রহস্য সেই বুঝে তুমি আমি কোন ছার—কোন কীটানুকীট! কি জান্‌বে কি বুঝবে! লীলারস পিপাসু ভক্তগণ, শ্রীশ্রী প্রভুর অমিয় লেখনীতে কোন্ পিযূ‌ষ ধারা সৃষ্টি হয়েছে—এক কথায় কেমনে কোটী গ্রন্থের সার সঙ্কলন হয়েছে—চিন্তা করুন, অনুধাবন করুন আর মূঢ়চেতা মন্দধী আমিও প্রভু কৃপায় 'তিনি যাহা জানান' তাই জেনে ক্রমশঃ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত কর্‌তে প্রয়াস পাব। ভরসা আছে, তাঁর একমাত্র কৃপা কটাক্ষ, যাহা—

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেশ্বর মণ্ডল বি, এল।

—

কালীহৈরার কিবা ভাগ্য !

আজ প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি কালীহৈরা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব দর্শন করিতে শ্রীহট্ট, জলসুকা হইতে ঢাকা দক্ষিণ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গনে গিয়াছিলাম। মেলার উদার বদান্যতা, আনন্দ দর্শন এবং রাগময় সঙ্কীর্ত্তনোৎসবগুণে এই ধাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ অথবা অভিন্ন নবদ্বীপ! শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলোৎসব বাসরের সকালবেলা গৌরাঙ্গানুরাগবিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-সমুদ্র তরঙ্গাবলী ভেদ করিয়া শ্রীঅঙ্গন মাঝে মীনের মত উপনীত হইলাম। মণিপুরী ও বাঙ্গালী নাগরীগণে শ্রীপ্রাঙ্গণ পূর্ণ নিবিড়! সঙ্কীর্ত্তন পুটিত নামসুধা ও উলু-উলু ধ্বনির মাধুর্য্য প্রবাহে আমি ডুবিলাম। প্রাণের কৌতূহল শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি। ঠাকুর যেন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মেঘের বিদ্যুৎবৎ শ্রীবিগ্রহের চন্দ্রবদন আমার নেত্রে ঝলক লাগাইল। দেখিলাম প্রভু সদ্যঃ তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়াছেন। অধররাগ ও তাম্বুলরাগ মাখিয়া স্মিতসুধা গণ্ডযুগল প্লাবিত করিয়াছে। সেইচন্দ্রবদন মাধুরী চপলার মত ঝলক দিয়া লুকাইল। লোকসংঘট্টে দর্শন ঢাকিয়া গেল। পঞ্চকোষাতীত প্রেমানন্দ সন্দোহ প্রবাহ আমার প্রাণ আকুল করিয়া উর্দ্ধগ হইল। আমি এক অদৃষ্টচর উজ্জ্বল দেশে উঠিয়া গেলাম। আমার ললাট মন্দিরের কপাট সহসা খুলিয়া গেল এবং উহা এক রসপীযূষপূর্ণ কুণ্ডবৎ প্রতীত হইতে থাকিল। তদবধি আমার ললাটদেশ উজ্জ্বল দেখি। এবং তদবধি সেই জ্যোতির্ব্বিন্দু ইন্দুর ন্যায় নানা তত্ত্বসুধা উদ্গীরণ করিতেছে এবং সেই সব নিবন্ধ ও পদাকারে যাবতীয় বৈষ্ণবসেবায় লাগিতেছে।

জাগ্রত সুষুপ্তিতে একবার পরম ভগবানের কৃপায় আমার চিত্ত মণ্ডলে শ্রীশ্রীরাসলীলা প্রকাশ পাইয়াছিলেন। দেখিয়াছিলাম, নীলপীত যুগল যুগল বিরচিত মালায় সেই সকল দিব্যমণি ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই স্বপ্নদর্শন প্রথম রাসদর্শন।

আমার ললাটপটস্থ জ্যোতির উৎস হইতে যে সকল তত্ত্বগর্ভ প্রবন্ধ শীকর কণা উদ্ভূত হইয়াছে তন্মধ্যে "মায়ের আশীর্ব্বাদ না দৈববাণী" এক গুরু গম্ভীর সন্দর্ভ। তাহা ক্রমশঃ "শ্রীগৌরাঙ্গ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছেন। তৎপাঠে কাশিমবাজার শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রথমাধিবেশনে শ্রীবৈষ্ণবগণ পরিবৃত শ্রীগৌড়রাজর্ষি মহারাজ শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতির সাক্ষাতে তদীয় সুযোগ্য সুবিজ্ঞ প্রধান সচিব মনস্বী মহানুভব দাদা আমার ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জ্ঞান গম্ভীর বক্তৃতার একাংশে বলিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু মহাশয়ের 'মায়ের আশীর্ব্বাদ না দৈববাণী' পাঠে আমি এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমি তদবধি কালীহর বাবুকে দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছিলাম।

শ্রীবাসাঙ্গণের সমৃদ্ধিমান শ্রীরাসলীলা "মনসা চিন্তিতা" উক্ত প্রবন্ধ সূত্রে সেবকদের এই প্রথম সম্মিলনীর উপলক্ষিত শ্রীসঙ্কীর্ত্তনে সাক্ষাদ্দর্শন ও আস্বাদন করিয়াছি। এই হইল শ্রীরাসলীলার সাক্ষাদ্দর্শন (প্রথম)। সেই রাসরসের প্রবল তরঙ্গ প্রায় একমাস আনন্দরূপে আমার অঙ্গে খেলিয়াছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় সাক্ষাদ্দর্শন ও সম্ভোগ হইয়াছিল নওয়াখালী, শ্রীধর্ম্মপুর ও দুবেলা চাঁদ গ্রামে। অতঃপর শ্রীরাসরসাস্বাদ ঘটিয়াছিল ময়মনসিংহ, মউহাটি ও পুকুরিয়া গ্রামে (রসের বন্যা বহিয়াছিল)। অতঃপর তাদৃশ ভাগ্য সঞ্চার হইয়াছিল নওয়াখালী, বাবুপুর শ্রীমান তারিণী মোহন ও শ্রীমান নক্ষত্র কুমার মজুমদারের মণ্ডপ গৃহে।

অতঃপর ফরিদপুর, শ্রীঅঙ্গনের কথা।

১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাস—শ্রীশ্রীসীতানবমী পুণ্যতিথি-যুক্ত দিবসে শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু দেবের আবির্ভাব। প্রভুর এই আবির্ভাবোৎসবের আনন্দোৎসবময় আহ্বানে ফরিদপুর ধামের শ্রীঅঙ্গন ধূলিতে যাইয়া লোটাইলাম। শ্রীঅঙ্গনের মোহান্ত শ্রীমন্মহেন্দ্র নাথ এক আদর্শ বৈষ্ণব, অতি শক্তি সম্পন্ন। তাঁহার দর্শন ও প্রেমালিঙ্গন—গাঢ় নিবিড় প্রেমালিঙ্গন পাইলাম। আমার তনু মুহূর্ত্তে ভাববতী হইয়া ভোগবতীর ধারা ঢালিল। পাট, ঘাট, মাঠ, হাট সমস্ত এক চিন্ময় আনন্দ রসে নিমগ্ন বোধ হইল। এই আনন্দ তরঙ্গিনী পরিবেষ্টিত মণ্ডল কেন্দ্রীভূতে এক বিশিষ্ট ঘনানন্দের আবর্ত্তনোত্থিত সুধার কলস কেবল সুধা উগারিতেছে, কেবল উগারিতেছে। বন্ধুহরির গণ সকলেই সরস্বতী সুত সকলেই কালবিদ্যা সুনিপুণ। মহামহাদশা নিমগ্ন শ্রীশ্রীবন্ধুহরি দেবের গূঢ়ানন্দ মূর্ত্তিকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাহারা শ্রীমন্দিরের আনন্দ পুলিনে পরিভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ ক্রমে মৃদঙ্গ করতালযুক্ত শ্রীশ্রীমহানাম সঙ্গীত গাইয়া ভাবোন্মত্ত হইতেছেন। আট বৎসর যাবৎ এই পরম নামানুকীর্ত্তনোৎসব অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছেন। অতি বিস্ময়কর বটে। এই গোলোক বেষ্টনী বিরজার আনন্দ বারিতে দুই দিন ভাসিলাম। এই বিরজার পুলিনরঙ্গে বাহ্যহারা হইয়া লোটাইলাম। তখন বেশ বুঝিলাম, শ্রীবৃন্দাবন রাসৌলী হইতে শ্রীরাসলীলা, যাহা শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাই আবার শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবন গুহা হইতে শ্রীরাসের লীলাধারা শ্রীবাসাঙ্গনে পতিত হইয়া রসের কুণ্ড রচনা করিলেন। সেই উদ্বেলধারা পুনরায় প্রবাহিত হইয়া ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে পতিত হইয়া এক নবকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই কুণ্ডোত্থিত আবর্ত্ত রাসরসের শীকরকণার মূর্ত্তি এক একটী বৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণ উলটি পালটি হরিনামানন্দ মদে প্রমত্ত হইয়া কীর্ত্তন কূর্দ্দন নর্ত্তন পূর্ব্বক সেই রসের ঢেউ তুলিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন। সবে রঙ্গে ভঙ্গে তালে তালে অপ্রাকৃত আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিগবধূ গণের প্রাণ শীতল করিতেছেন।

সৃষ্টিস্থিতিলয় এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জন্মজীবনমরণরূপ এক বহিরঙ্গ খেলা। স্থূলাভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মবৎ ঐশ্বর্য্যের খেলাও গূঢ়। কিন্তু তদভ্যন্তরীণ অন্তরন্তর্ভূত বিদ্বৎ ধামৈকসিন্ধু সকল বিরাজমানা। এই সদানন্দ সিন্ধুর তরঙ্গগুলিই পরানন্দ পরম ভগবানের ভক্তবর্গ। এই আনন্দসলিল ঢেউয়াইয়া সদা প্রভু অনাদিরাদি যুগাবধি নৃত্যরসে বিভোর আছেন। "আপনি নাচি জগৎ নাচান"? এই রাসরসানন্দ জীবনই (জল) জগতের জীবন (প্রাণ) ভক্ত মণ্ডলীর প্রাণ ফোয়ারায় এই রসের জোয়ার বহিতেছে। এই সুধারসেরই ছিটা ফোটা ফুলের মধু, চাঁদের সুধা যোগাইতেছে। সুখের যত উৎস, সবই এই রাসলীলার উৎক্ষিপ্ত ধারা। তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম, একটী ধারায় ৬ দিবস সন্তরণ করিলাম। শ্রীশ্রীরাসলীলার রসরাজ যিনি তিনি সগুণ ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে। ব্রহ্মার একদিন ইহা একটা কথার কথা। উহা অনাদি অনন্ত, দ্বৈধ প্রকটাপ্রকট ভাবে নিত্য সনাতনী।

শ্রীরাসলীলা পদ্মের প্রথম দলে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের আনন্দ কেলি—দ্বিতীয় দলে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের—এবং তৃতীয় দলে শ্রীশ্রীবন্ধু গোবিন্দের আনন্দ কেলি। গুরু গোবিন্দ উহার খণ্ড বিলাস ব্যষ্টি ভাবে বিচরণ করিতেছে।

গোপী ব্রজে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের রাসোল্লাস ভক্তিব্রজে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ নিত্যানন্দের রাসোল্লাসময়ী সংকীর্ত্তনলীলা এবং বন্ধুব্রজে এই যে বর্ত্তমান শ্রীশ্রীবন্ধু গোবিন্দের রাসোল্লাসময় মহানাম সঙ্কীর্ত্তন বিলাস! সেদিন তাহাই সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। অত্রত্য সেবাইত বৈষ্ণবগণ নবযৌবন যুক্ত উদাসীন ব্রহ্মচারী নির্ম্মল চরিত্র। ইহারা জাতি-নির্ব্বিশেষে সেবার এবং "নক্তন্দিবম্" রাসরস আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দের নর্ত্তনে যে তুফান উঠে, উহাই শ্রীরাসলীলা। দ্বাপরে গোপীসঙ্গে কলিতে ভক্তসহ এই রাসের উচ্ছ্বাস বয়।

আমার প্রিয় বান্ধবগণ পাঠে হাসিবে না যে আমি জীবাধম প্রাণের অন্তস্তল হইতে তুলিয়া একটি সত্য আপনাদের অন্তশ্চিন্তার করে উপহার দিতেছি ইদানীং আমার চিত্তে এক বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে নদীয়ার বিদগ্ধ দ্বিজরাজ আমাদের প্রাণতোষ নিতাই গৌরাঙ্গ এই যে কলিযুগেই দ্বিতীয়

আবির্ভাব যারা শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু হইয়াছেন। এই বিশ্বাস আমার দৈনন্দিন বিকাশসূত্রে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। পূর্ব্বে "বন্ধু" শব্দে আমি এত মাধুর্য্য অনুভব করিতাম না। ইদানীং "বন্ধু" বলিতে যেন, অমৃতের সিন্ধু উথলে। ইহা বোধ হয়,কোন কৃপাবিশেষের পরিপাক। পরমেশ্বর এক অসমোর্দ্ধ! তাঁহার লীলা অনন্ত। অনন্ত লীলাপরিধির কেন্দ্রস্থ একমাত্র অমৃত পুরুষই বিরাজমান। তিনি আত্মারাম তৎস্বরূপশক্তির বিভূতি প্রকাশেই শ্রীরাস তরঙ্গ। তিনি নিত্যশিশু (ব্রজশিশু), স্বরূপশক্তি কটাক্ষবিক্ষেপে তিনি কিশোর প্রতীত হন॥ কৈশোরের রসচাতুর্য্য বিস্তার শ্রীরাসলীলা। ইহাই পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপত্ব। তিনিই জগবন্ধু (জগজ্জনবন্ধু) তিনিই ভক্তগণ বন্ধু, তিনিই গোপীজন প্রাণবন্ধু।

সেদিন শ্রীশ্রীবন্ধু হরি নিজ করপল্লবে লইয়া এক লীলারসের ফোটার ছিটা হলদিয়াস্থ আমার বাসায় আমার চক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যাপার অতি বিস্ময়কর! তাই আমি মুগ্ধ হইয়াছি! শ্রীমন্মহেন্দ্র নাথজী শ্রীঅঙ্গনের দেবপ্রতিম মোহান্ত। ইনি আমার প্রার্থনানুসারে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বন্ধু ব্রজের ধূলি পত্রে ভরিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তাহা জানিতাম না। পরম পত্রং শিরসি ধৃত্বাহং পঠম্। কিন্তু পত্র সঙ্গে ধূলির পুঁটলী বা অপর চিহ্ন পাঠাইলাম না। মহেন্দ্রদাদা আলগা ভাবে রজঃ দিয়াছেন, হয়তো শয্যাসনে পড়িয়া গিয়াছে। রাত্রিকাল, আন্দাজে শয্যাসনে মাথা ও কপাল ঘসিলাম। কিন্তু রজের কোন স্পর্শ ঠেকিল না। ক্ষুব্ধচিত্তে কিয়ৎক্ষণ খেদ করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন সকালে আমার শেরেস্তার বাক্স খুলিলাম। লেখা পড়া করিব। বাক্সের এক খোপে মুখবাসের একটি গ্লাস থাকে। উহাতে সহসা দৃষ্টি পড়িল এবং একটী কাগজের পুরিয়া উহাতে পাইলাম। দেখি একি, এই না বন্ধু-ব্রজের পরম দিব্য ধূলি। জয়, জয়নিতাইর বন্ধু হরি! মহানন্দে উহা গ্রহণ করিয়া বন্ধু ঠাকুরের লীলামাধুরীর অপরূপত্ব চিন্তা করিতে করিতে স্তম্ভিত হইলাম। জয় গৌর বন্ধু হরি! জয় জয় বান্ধবগণের জয়! "কালীহরের কিবা ভাগ্য!" সবে ভাবুন। আপনাদেরই চরণাশীর্ব্বাদের বলে।

জীবাধম
শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর
হাঁসাড়া, ঢাকা।

পুষ্পাঞ্জলি।

সরব মঙ্গলময় পরম ঈশ্বর।
নমামি চরণে দেব করি জোড়কর॥
সরব স্বরূপ তুমি সর্ব্ব শক্তিময়।
কর দয়া অনাথেরে প্রভু দয়াময়॥
সংসারার্ণবে পড়ি ভয়ে ভীত হ'য়ে।
ডাকিহে তোমায় প্রভু উঠাও ধরিয়ে॥
জগবন্ধু জগন্নাথ জগতের বন্ধু।
তরাও অকুলে নাথ করি কৃপা বিন্দু॥
অপার করুণা তুমি দীন বৎসল।
করুণা করহে প্রভু নাহি অন্তবল॥

পরম দয়াল প্রভু মঙ্গল আধার।
পতিত উদ্ধার লাগি হ'লে অবতার॥
প্রেমের পুতুল তুমি প্রভুহে আমার।
ভকতের তরে শুধু হ'লে নরাকার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যারে ধ্যানে নাহি পে'য়ে।
কত যুগ আছে তার পথ পানে চে'য়ে॥
বুদ্ধির অতীত যিনি স্থির স্বরূপেতে॥
অদ্বিতীয় সেই তুমি ফুটিলে রূপেতে॥
তাও জীব জগতের করুণ ক্রন্দন।
দ্রবিল কি বক্ষ তব উঠিল স্পন্দন॥

প্রেম গঙ্গা বুকে তাই করিয়ে ধারণ।
উন্মাদের বেশে ছুটি মর্ত্তে আগমন॥
অমনি সপত লোক উঠিল কাপিয়া।
ত্রিশ কোটী দেবতার আসিল নামিয়া।
জয় জয় জয় জগবন্ধু সবে বলি বলি।
আবাহন করে প্রেমে পাতিয়া অঞ্জলি॥
তোমারে পাইয়ে নাথ পরম আনন্দে।
জয় জয় রব করি সকলেতে বন্দে॥
বলে সবে জগবন্ধু দুর্গতি হরিতে।
বন্ধুরূপে দেখা দিল এই অবনীতে॥
এস মহা যোগী ঋষি আচার্য্য ব্রাহ্মণ।
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত দেবগণ॥
করগো, অর্চ্চন এই বিশ্বেশ্বর নাথে।
ডাক প্রাণ খুলি সবে অবনত মাথে॥
পাদ্যঅর্ঘ্য ধুপদীপ পত্র পুষ্প ফল।
কি আছে মোদের তুমি জানত সকল॥
লও এই অশ্রু-সিক্ত প্রাণ-পুষ্পাঞ্জলি।
কি আছে মোদের আর কিবা দিব তুলি॥
মোরা বড় দীন প্রভো তোমারিত দাস।
কর প্রভু এ বিশ্বের দুর্গতি বিনাশ॥
পাপ তাপ রোগ শোক অকাল মরণ।
হর প্রভু জগবন্ধু মহা উদ্ধারণ॥
অজ্ঞান অধম মোরা করিছে প্রণতি।
দেও তুলি শিরে পদ হরিতে দুর্গতি॥

শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায়ের পদাঙ্কানুরনকারী
মতিশূন্য বন্ধু হরি মাধব দাস
কাঁটালিয়া, ময়মনসিংহ।

ধর্ম্মকথা।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অনন্ত বিশ্বে অনন্ত জীব জগতের যেই যেই জীবজগতে যখন যখনই ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া, দুঃখ অশান্তি জনিত হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হইতে থাকে, পরমদয়ালু, অনন্ত, অনন্তবিশ্বময়, বিশ্বরূপ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান হরি সেই হাহাকার নিবারণার্থে আবশ্যক, তৎকালোচিত, দুঃখ অশান্তি নিবারক, সুখ শান্তি কারক, ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া তাহা অবলম্বন করাইতে, সেই সেই জীব জগতে তখন তখনই কিছুকালের জন্ম অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

অন্যতম বর্ত্তমান সপ্তম মন্বান্তরের বর্ত্তমান অষ্টবিংশতিতম মহাযুগের অন্তর্গত গত দ্বাপর যের শেষ ভাগে এবং বর্ত্তমান কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান হরি শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ থাকিয়া তৎকালে যে যে ধর্ম্ম মানব জগতের অবলম্বনীয়, তাহা কর্ম্মযোগে প্রদর্শন করিয়া, সর্ব্ব যুগে মানব সাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য সাধারণ ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কলিযুগে স্বভাবতঃ তম গুণের অত্যধিক প্রাবল্যে ও প্রাদুর্ভাবে, প্রায় পোণে ষোল আনা মানব জগৎ ইন্দ্রিয় পরবশ সুতরাং অজ্ঞানাচ্ছন্ন সুতরাং অহঙ্কার মত্ত এবং আলস্য পরায়ণ থাকিয়া তৎ প্রদর্শিত তৎ প্রকাশিত ধর্ম্ম অবলম্বন না করায় ও করিতে না থাকায়, কয়েক সহস্র বৎসর পরেই ভগবান হরি আবার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়া, কলিকালে কেবল হরিনাম

সংকীর্ত্তন, হরিনাম জপ, হরিনাম ধ্যানই জীবউদ্ধারণ, সহজ সাধ্য ও সহজে অবলম্বনীয় মহাধর্ম্ম, ইহা কর্ম্ম যোগে প্রচার করিয়াছিলেন। সত্যবটে, তৎ প্রচারিত হরিনাম গ্রহণ করিয়া, রূপ, সনাতন, জগাই, মাধাই, হরিদাস প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত মাত্র প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সংশয়াত্মা, শ্রদ্ধাহীন, এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনুষ্যাকৃতি অধিকাংশ জীবই আলস্য দীর্ঘসূত্রতাদি দোষে যেই তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়াই সুদুর্লভ মনুষ্য জীবন বৃথা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে পরম কারুণিক জগদ্বন্ধু ভগবান হরি কয়েক শত বৎসর পরেই আবার সেই হরিনাম মহানাম কীর্ত্তনরূপ মহাউদ্ধারণ মহাধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু রূপে অবতীর্ণ হইয়া মহা উদ্ধারণ মহীয়সী কীর্ত্তি দেখাইয়া অবশেষে অবিরাম অনুষ্ঠেয় হরিনাম মহানাম কীর্ত্তন রূপ মহাউদ্ধারণ মহাযজ্ঞ, বঙ্গের ফরিদপুর জিলায় ফরিদপুর সহরের অতি সন্নিকট শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন!

আজ প্রায় এই দশ বৎসর যাবত ঐ শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে ঐ হরিনাম মহানাম কীর্ত্তন রূপ মহাযজ্ঞ অভূতপূর্ব্বরূপে অবিরাম প্রজ্জ্বলিত আছে। তাই শ্রদ্ধাবান ভক্তবৃন্দের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু বস্তুতঃ এখনও দেহ রক্ষা করেন নাই। তিনি এখনও ঐ মহা উদ্ধারণ মহানাম কীর্ত্তন যজ্ঞ সহ শ্রীঅঙ্গনে বিদ্যমান আছেন।

এই মহাউদ্ধারণ মহাযজ্ঞে কলির অন্ধ-মূঢ়-জড় সর্ব্ব জীব জগতের যে কি মহাহিত সাধন হইতেছে ও হইবে তাহা অজ্ঞানতা ও তন্মূলক বৃথা অহঙ্কার বশতঃ আমরা এখনও বুঝি নাই ও বুঝিতে পারি নাই বটে কিন্তু অচিরকাল মধ্যে এমন দিন আসিতেছে, যখন বঙ্গের প্রতি জিলায় প্রতি গ্রামে ঐরূপ মহানাম যজ্ঞ অনুষ্ঠীত হইতে থাকিয়া, সেই যজ্ঞালোকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারত, সমস্ত জীবজগত সমালোকিত হইবে ও হইতে থাকিবে—সমস্ত জীব জগতের মহা উদ্ধারণ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে হরিনাম মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া পরিত্রাণ পাইতে থাকিবে—যখন "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই বাক্যের অকাট্য সত্যতা উপলব্ধি করিয়া আপামর সকলে সংমিলিত হইয়া হরিনামে নৃত্য করিতে থাকিবে। ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়া ভক্তি সহকারে সংপূজিত হইতে থাকিবে।

মোহঘুমে অচেতন, অনিত্য-বৃথা-বিষয় জ্ঞান মদে মত্ত, অজ্ঞানতা হেতু বৃথা অহঙ্কারাচ্ছন্ন হে কলির জীব, তুমি কেবল ইন্দ্রিয় পরায়ণতা হেতু অজ্ঞানতার প্রাবাল্যে, অনিত্য সংসার ক্ষেত্রকে চির বাসস্থান এবং অনিত্য দেহ, গেহ, বিত্ত-ধন-জন পদ প্রভৃতিকে নিত্য মনে করিয়া মায়া বা ভ্রান্তি বশতঃ অনুক্ষণ কেবল তদর্থে, তল্লাভার্থে, এবং তৎ-রক্ষার্থে ব্যস্ত থাকিয়া, প্রকৃত মর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া গিয়া কোন্ আশায় কোথায় ডুবিতেছ? ক্ষীর বা দুগ্ধের অদৃশ্য সারভাগ ঘৃত বা মাখন যেমন দৃশ্য অসার ভাগকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া অবস্থিত থাকে অন্তর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানময়, নিত্যানন্দময়, চিরশান্তিময় সর্ব্ব-শুভময়, এবং সর্ব্বোৎকর্ষময় অদৃশ্য সারভাগ পরাপ্রকৃতিও তেমন অন্ত জগৎরূপে যে, অবিদ্যাময়, দুঃখময়, অশান্তিময় অমঙ্গলময়, সর্ব্বাকর্ষময় দৃশ্য অসার ভাগ পাঞ্চ-ভৌতিকী অপরা প্রকৃতি-রূপ বহির্জ্জগৎকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে, এই প্রকৃত মর্ম্ম বা সত্য একেবারে ভুলিয়া কোন কামনায়, কোন লোভে, বারবার লক্ষ লক্ষবিধ লক্ষলক্ষ দেহে আবদ্ধ হইয়া অবিরাম উক্তবিধ অপরাপ্রকৃতির বা বহির্জ্জগৎরূপ (ইন্দ্রিয়) বিষয় সাগরে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছ? বিষময় বিষয়-সাগরে ডুবাইয়া বা নিমগ্ন হইয়া তাহাতে অমৃত-রত্ন-লাভের লোভ কি তোমায় মায়া-মোহ-ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতার পরিচায়ক নহে? মায়া-মোহ-ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা জনিত তোমার এই দুর্দ্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া, পরম দয়াময় জগৎ-পিতা জগদ্বন্ধু ভগবান, যুগে যুগে নানা দেহে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম-যোগে ও শাস্ত্রাদি প্রণয়ন ও প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম কথা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, আর তুমি মায়া-মোহ-ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা-বশতঃ কেবল জড়বাদী হইয়া ঐ মহা-উদ্ধারণ ধর্ম্ম-কথায় কর্ণপাত না করিয়া বা করিতে না থাকিয়া, ডুবিয়া ডুবিয়া কেবল হাবুডুবু খাইতেছ। ভাই! আমি তোমারই অন্যতম সাথী, সহচর বা ভ্রাতা, কিছু দিনের

চেষ্টায় বা প্রযত্নে মহা-উদ্ধারণ ধর্ম্মের যেটুকু মর্ম্ম, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, পরম কারুণিক জগৎ পিতা জগদ্বন্ধু ভগবান যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া এবং ব্যাসাদি ভক্ত মুখে যে ধর্ম্ম বার বার প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই ধর্ম্মের সেইটুকু মর্ম্ম-কথা, আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলের বোধগম্য ভাষায়, অতি সরলভাবে, তোমাকে বলিতে বাসনা করিয়াছি, আমার সানুনয় প্রার্থনা যে তুমি, ক্ষণকালের জন্য অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, মনোযোগ সহকারে সেই কথা একবার শ্রবণ কর, যদি বল, "আমি ও ধর্ম্মজ্ঞ, আমি ধর্ম্ম কথা বহু শুনিয়াছি, তাহা শুনিবার প্রয়োজন আমার নাই" তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ধর্ম্ম কথা কখনও পুরাতন হয় না, তাহা নুতন গণ্যে সর্ব্বদাই শ্রোতব্য, তাহা যতই শ্রুত হয়, ততই তাহার মধুরতা বাড়ে, ততই শ্রোতার চিত্তের মলিনতা ক্রমশঃ বিদূরিত করিতে থাকিয়া, হৃদয়ে জ্ঞানোদয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। বিশেষ আমি যে ভাবে ধর্ম্ম কথা বলিব সেই ভাব, নূতন, অভিনব, অশ্রুত পূর্ব্ব এবং প্রীতিকর বলিয়াই তোমার বোধগম্য হইবে। আমি সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে তুমি ধর্ম্মকথা অবহিত চিত্তে শুনিলে, ধর্ম্ম চর্চ্চায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, এবং ধর্ম্মাবলম্বনে তোমার মতিগতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং দুঃসাধ্য ধর্ম্মকর্ম্ম সহজ সাধ্য বলিয়াই তুমি মনে করিবে, এতৎসহ আমার আর একটু বক্তব্য এই যে, "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" এই অকাট্য সত্য বাক্যের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই ধর্ম্ম কথার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব চিকিৎসা প্রণালীও তোমার নিকট ব্যক্ত করিব। ঐ প্রণালী মতে চলিলে তুমি সুস্থ শরীরে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে, এবং কোন কারণে কোন সময়ে শরীর অসুস্থ হইলে, সেই শরীর পুনঃ সুস্থ করিতে তোমায় কোন বেগ পাইতে বা কিছুমাত্র পয়সা ব্যয় করিতে হইবে না।

এখন, তমোগুণ হেতু আলস্য এবং অজ্ঞানজ বা অজ্ঞানামুজ অহঙ্কার কিছু দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, অবহিত চিত্তে, মনোযোগ সহকারে, সহজে বোধগম্য, সরলভাষায় কথিত, এবং সুখ-শান্তি লাভার্থে অবশ্য জ্ঞাতব্য এই সুদীর্ঘ ধর্ম্ম কথা শুনিতে আরম্ভ করার পূর্ব্বে, ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এবং ধর্ম্মের প্রকৃত মূল রহস্য বা ধর্ম্মতত্ত্ব যে কি, তাহা শ্রবণ কর, তাহলে সহজেই বুঝিবে যে অনিত্য, অসত্য, পয়োমুখ বিষকুম্ভ প্রতিম দুঃখালয় এই ভব বা বিষয় সাগরে, ধর্ম্মচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট, এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান কর্ম্মহীন জীবের সুখ শান্তির আশা আকাশের চাঁদ ধরিতে সমুৎসুক উদ্বাহু বামনের আশার ন্যায় সম্পূর্ণ বৃথা ও নিষ্ফল বটে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুঞ্জ বিহারী চট্টোপাধ্যায় বি, এল ওরফে
সত্যানন্দ স্বামী—বরিশাল।

ত্রিকালে যুগধর্ম্ম।

"হরি শব্দ উচ্চারণ"

"হরিপুরুষ উদয়"

স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীশ্রীহরি মায়াধীশ। এই মায়িক সৃষ্টির সহিত তাঁহার লেশমাত্র সম্পর্ক নাই! তিনি নামরূপী; নামের সহিত বিরাজ করেন। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ"। হরি শব্দ উচ্চারণ মাত্র হরিপুরুষ উদিত বা আবির্ভূত হয়েন। হরি এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিতে হইবে বলিয়া অন্য অক্ষর যুত ভগবন্নাম উচ্চারণের অনাবশ্যকতা জানাইতেছেন। হরি শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ উচ্চারণ করিলে শুদ্ধ মাধুর্য্যরূপী স্বয়ং হরি উদিত হইবেন না। অর্থাৎ স্বয়ং হরির আবির্ভাব কেবল মাত্র 'হ' আর 'রি' এই দুইটী অক্ষর মাত্র উচ্চারণেই হইবে অন্যথায় নহে! দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে, সব নাম ও ধর্ম্মের সমন্বয়কারী এই মহাসত্য অবিশ্বাস করিয়া সকল নামেরই ফল সমতা বুঝাইতে ব্যগ্র

হইয়া "হরের্নামৈব কেবলম্" শ্লোকের যে কদর্থ করিতেছেন তাহাতে শ্রীমন মহাপ্রভুর ব্যাখ্যাও হার মানিয়া গিয়াছে। কারণ, তিনি শ্রীভগবানের অনন্ত প্রকার নাম থাকিতেও কেবল মাত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিতেই বলিয়াছেন। অন্যান্য যুগে অন্য নামের সার্থকতা থাকিলেও এই ঘোর কলিহত জীবের উচ্চারণের জন্য কেবল মাত্র হরি নাম। এ যে ঘোর কলিযুগ। মুমূর্ষু রোগীর হিমাঙ্গ হইলে অন্য সকল ঔষধ বন্ধ রাখিয়া সুবৈদ্য কেবলমাত্র মকরধ্বজই সেবন করাইয়া থাকেন। সেইরূপ বর্ত্তমান যুগের কেবলমাত্র ধর্ম্ম হরিনাম ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীমন মহাপ্রভু তিনবার, নাস্ত্যেব পদ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সমন্বয় পন্থীদের হাতে প'ড়ে সকল নামই হরিনাম এবম্বিধ রূপে এ মহানাম কদর্থিত না হয় তজ্জন্য ধাজ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা অনন্তজ্ঞানময় শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধু "হরি" এই শব্দটি দুটি অক্ষরযুক্ত মাত্র এই শব্দটিই উচ্চারণ করিতে হইবে এই কথা স্বরচিত পরমতত্ত্বময় শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে সূত্র করিয়াছেন। মহানামে অবিশ্বাস হেতুই কলির জীবের ঘোর দুর্দ্দশা। তাহা নিবারণ করিবার জন্যই এত সুস্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগে হরি শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত উদ্ধারণ প্রয়াসী জীবের অন্য পন্থ নাই। এই মহা সত্য অবিশ্বাসই কঠোর দুর্গতির কারণ। শ্রীশ্রীবন্ধু হরিনামের মাহাত্ম্য জানাইতে অন্যত্র বলিয়াছেন।

"হরিনাম শব্দ হরিঠাকুরের নাম নহে। যেমন পুষ্পবৎ বা পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র সূর্য্য বুঝায়; সেইরূপ নিতাই গৌর গোপী রাধাশ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরি বোল বল্‌লে সবই বলা হয়, হরিনাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করবে যেন সহস্র হস্ত দূর হইতেও শ্রবণ করা যায়। হরিনাম উদ্ধারণ মন্ত্র যাহাতে সমস্ত জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম শুনতে পারে তা ক'রো।"

এই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মেই অল্প বিস্তর নামের সাধন আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীই ভগবানের কোনও না কোন নাম উচ্চারণ করে। এই হরিনামের মধ্যে সেই অনন্ত ঈশ্বর ঈশ্বরীর নাম লুক্কাইত রহিয়াছে সুতরাং এক হরিনামেই সব হয় উহাতে—

"স্বকীয় পরকীয় উদ্ধার সাধন।
অপিচ চতুর্দ্দশ ভুবনের মহা মাঙ্গল্য বিধান।'

এত বড় মহা সত্য আমার পরম দয়াল প্রভু ব্যতীত কে কবে শুনাইয়াছেন? এই কলিযুগে হরিনামে অবিশ্বাসই একমাত্র ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মহানামে বিশ্বাস হারাইয়া 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' এই আপন প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে ও ঘোর মহাপাপী হইয়া অনন্ত দুঃখ সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। হায়! কবে আবার জীব "হরিশব্দ উচ্চারণ" করিতে করিতে স্বস্বরূপে স্থিত হইবে। কবে আবার কুদিন ঘুচিয়া সুদিন ফিরিয়া আসিবে। কবে হৃদয়ে হৃদয়ে হরিপুরুষের উদয়ে সর্ব্বজীব পরাশান্তি লাভ করি?

মহানাম প্রহরী শ্রীঅমূল্য ভূষণ মল্লিক।

বিগত ১৩৩৭ সনের
শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শুভ জন্মোৎসব বিবরণী

অহিংসা, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত্ত আদর্শ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের "শুভ জন্মোৎসব" বিগত ১৩৩৭ সালের ২৪ শে বৈশাখ সীতা নবমী তিথি হইতে ৩১ শে বৈশাখ পর্য্যন্ত ৬৪ প্রহর ব্যাপী জগন্মঙ্গল শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রসঙ্গাদি দ্বারা ফরিদপুর গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শুভ জন্মোৎসব শ্রীঅঙ্গনের সেবক বৃন্দ কর্ত্তৃক জন সাধারণের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইত। গত ১৩৩৬ সনের শেষভাগে স্থানীয় জন সাধারণ ও শ্রীশ্রীপ্রভুর সেবকগণ সমবেত হইয়া জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণ সভা আহ্বান পূর্ব্বক একটী উৎসব কমিটী গঠন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। উৎসবের অতি অল্পকাল পূর্ব্বে কমিটী কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া

যথাসাধ্য উৎসবটীকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করেন; এ বিষয়ে তাহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সর্ব্ব সাধারণের বিবেচ্য।

উৎসবে বহু জন সমাগম হইয়াছিল। কমিটীর বহু প্রকার ত্রুটি থাকা সত্বেও, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহারা আগ্রহের সহিত জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব সম্প্রদায় সমন্বয়ে উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলার সহিত উৎসবটী পরিচালিত করিয়াছেন এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, উৎসব কমিটী তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। আগামী উৎসবেও সর্ব্বসাধারণের এইরূপ উৎসাহ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইতে কমিটী নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন না।

আলোচ্য বৎসরের উৎসব কার্য্য সম্পাদান, যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, আগামী বৎসরে উৎসব কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে তৎ সম্বন্ধে সহৃদয় মহোদয়গণ কেহ কমিটীকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে, কমিটী ঐ সকল ত্রুটি সংশোধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

বিগত উৎসব কার্য্যে ফরিদ পুর মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে উৎসব কমিটী যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য কমিটী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক উৎসব কার্য্য তত্বাবধান করিয়াছেন, যুবকগণ স্বেচ্ছাসেবক রূপে যথেষ্ট কার্য্য তৎপরতা দেখা হইয়াছেন, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সমাগত মহোদয়-গণের পাদুকা, যষ্টি, ছত্র, দ্বিচক্রযান ইত্যাদি সংরক্ষণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মহিলা স্বেচ্ছা সেবিকাগণ, মহিলা ও বালকবৃন্দের শৃঙ্খলার ভার গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ফরিদপুরের সুবিখ্যাত দত্ত ব্রাদার্স তাঁহাদের স্বর্ণ কুটীর নামক দ্বিতল বাড়ী উৎসব কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, কমিটী কার্য্য বিভাগ করিয়া যাঁহাদের প্রতি যেরূপ কার্য্য ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা আগ্রহের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

ফরিদ পুরের শান্তি সমিতি উৎসবের কয়েক দিবস অবিরাম পরিশ্রম সহকারে রন্ধন ও প্রসাদ বিতরণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই তাঁহারা এই কঠোর কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কার্য্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এবং প্রশংসনীয়।

অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রম সহকারে সহর ও সহরতলী এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উৎসবের অর্থ ও তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কার্য্যে মহিলাগণের মধ্য হইতে ও আমরা যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহিলা কর্ম্মী কুমারী শান্তিদেবী ও শ্রীযুক্তা ইন্দুদেবী, প্রমুখ মহোদয়াগণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

উৎসবের ভাব বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণ উৎসবটী ৫৬ প্রহর স্থানে ৬৪ প্রহর রক্ষা করিয়াছিলেন। উৎসবে শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভাগবত ভূষণ, মহোদয়ের শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণ পাঠ, শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবত রত্ন, শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কতীর্থ ও ভক্তিসাগর শ্রীযুক্ত কালিহর বসু মহোদয়গণ ভাগবত বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রাণাধিক গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যেশ মহান্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন মহান্ত, শ্রীমৎ গোপী বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী পাটনা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় টেপাখোলা ও স্থানীয় অন্যান্য কীর্ত্তন সম্প্রদায় ৬৪ প্রহর ব্যাপী সুললিত পদকীর্ত্তন ও নাম গানে শ্রোতৃবৃন্দকে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উৎসব কমিটী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

শ্রীমৎ রাম দাস বাবাজী মহারাজ অনিবার্য্য কারণে এই উৎসবে যোগ দান করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন। কমিটী আশা করেন, আগামী বৎসর তাঁহার উপস্থিতি সম্ভবপর হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও স্থান সমূহ হইতে মহোৎসবের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

(১) টেপা খোলা বাসী, ইহারা ২ দিনের মহোৎসবের ব্যয় বহন করিতেছেন।

(২) শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র তহবিলদার (হাটকৃষ্ণ পুর) ১ দিন।

(৩) ফরিদপুর গোয়ালচামট বাসীগণ ১ দিন।

(৪) ফরিদপুর চক বাজার চাউল পটি ও অন্যান্য দোকানদারগণ ২ দিন।

(৫) কলিকাতা, রেঙ্গুন, ঢাকা, চন্দন নগর, পবিনা, কাশী, এলাহাবাদ, কৃষ্ণপুর, গোয়ালন্দ, মুর্শিদাবাদ, কোয়াল মারী, পাংশা, খানখানাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে মহোৎসবের বাবদ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

উৎসবের জন্য মোট ১১৫১ ১৫ এগার শত একান্ন টকা পৌণে পাঁচ আনা চাঁদা সংগৃহীত ও তন্মধ্যে ৯২৬৶৫, নয় শত ছাব্বিশ টাকা নয় পয়সা উৎসবে খরচ হইয়াছে; অবশিষ্ট ২২৫৶১০ দুই শত পঁচিশ টাকা দশ পয়সা হইতে, জন সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে উৎসব কমিটী শ্রীঅঙ্গনের কীর্ত্তন মন্দিরের ছাঁদ নির্ম্মানের সাহায্য কল্পে ২০০৲ দুই শত টাকা প্রদান করিলেন। কমিটীর হস্তে এক্ষণে ২৫৶১০ পঁচিশ টাকা দশ পয়সা নগদ তহবিল। আয় ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হিসাব পরীক্ষক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ উকিল মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন।

স্বাঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদক
স্বাঃ শ্রীমহেন্দ্র জী সম্পাদক
স্বাঃ শ্রীনলিনী বন্ধু গুপ্ত সহ সম্পাদক
স্বাঃ শ্রীকামিনীকুমার রায় সহঃ সভাপতি
স্বাঃ শ্রীইন্দু ভূষণ সরকার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শুভ জন্মোৎসবের ১৩৩৭ সনের আয় ও ব্যয় হিসাব উৎসব সমিতির হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত কালি প্রসন্ন ঘোষ উকিল মহাশয়ের দ্বারা সংশিত হইয়া সাধারণের গোচরার্থে নিম্নে প্রদত্ত হইল—

আয়

বিবরণ	টাকা	আনা	পাই
১। উৎসব উপলক্ষে টাকা আদায় মোট মাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দু ভূষন সরকার মহাশয়ের খাতায়	৮৮১	৶	৩
২। মাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত খাতায় ২২৬৷৵৹ আনা মধ্যে শ্রীযুত ইন্দু বাবুর খাতায় ১০৩৬ জমা দেওয়া বাদে বক্রী জমা—	১২৯	৸৵৹	৬
৩। শ্রীঅঙ্গনের সেবক শ্রীমৎ উদ্ধারণ দাসের লিখিত খাতায় মোট জমা ৫৬৭৵৹ মধ্যে শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবুর নিকট হইতে প্রাপ্ত ৪২৫৸৵৹ বাদে বক্রী জমা—	১৪১	।৹	—
৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৬৫৵৹ বহিতে মাঃ মঙ্গলচরণ মুখোপাধ্যায়	৫	—	—
	১১৫১	।৹	৯

ব্যয়

	বিবরণ	টাকা	আনা	পাই
১।	ছাপা খরচ	২৮	॥৵৹	৬
২।	ডাক খরচ	১০	।৶৹	৬
৩।	যাতায়াত ব্যয়	৫১	৸৵৹	৯
৪।	মহোৎসব ও সেবা পূজাদির খরচ	৩৯৩	॥৵৹	৬
৫।	নল কূপ ব্যয়	২০	।৹	—
৬।	বিবিধ খরচ	১৩	৸৶৹	—
৭।	বেতন খরচ	৪২	৸৶৹	—
৮।	কয়লা খরিদ বাবদ	৬৭	।৶৹	—
৯।	কীর্ত্তনীয়া ও বক্তাগণের বাবদ ব্যয়	২৯৭	—	—
		৯২৬	৵৹	—
১০।	খরচ বাদে উৎবৃত্ত	২২৫	৵৹	৬
		১১৫১	।৹	৯

এতদ্ভিন্ন চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদিতে প্রায় ৬০০ টাকার জিনিষ পাওয়া গিয়াছে—এবং উহা প্রভুর মহোৎসবে ব্যয়িত হইয়াছে।

হিসাব পরীক্ষা করিয়া নির্ভুল দৃষ্ট হইল।

স্বাঃ—শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ।

১।২।৩১

স্বাঃ শ্রীইন্দু ভূষণ সরকার
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ

যেমন অতলে বিচরে মীন,
তেমন বামা দীননাথ আত্মস্থ উভয়ে
বাৎসল্য-বারিধি-লীন।
যেমন মথিলে অমিয়া উঠে,
তেমন আত্মস্থ হৃদয়ে আসে রসময়
যেমন ফুটিলে সৌরভ ছুটে।
যেমন সাধুজন মনে মুখে,
তেমন অন্তরে বাহিরে দুইটি জগৎ
ছায়া-কায়া হেন থাকে।
যেমন হিমালয়ে মানসর,
তেমন শান্ত দীননাথ গিরিরাজ সম
বামা মানসরোবর।
যেমন গঙ্গা হ'ল মানহ্রদে,
তেমন মধুর বাৎসল্য শতমুখী ধারা
ছুটে বামাদেবী হৃদে।
যেমন গন্ধ চন্দন-বুকে,
কেমনে বাতাস বহি' আনে তারে,
গন্ধবহ বলে লোকে।
তেমন হৃদয়-সরোজ ফুটিল,
কেমনে কে জানে সুরধুনী তারে
বাহিরে বহিয়া আনিল।
যেমন মধুরে মাধুরী আঁকা,
তেমন পদ্মে ভাসিয়া পদ্মপলাশাঁখি
শিশুরূপে দিল দেখা।
যেমন ভাব রহে রস-জুড়ি';
তেমন চন্দ্রপুত্রধন ভুবনে উদিল
চন্দ্রিকা আশ্রয় করি।

যেমন উজল সোনালী বীচি,
তেমন কুন্দনে কল্লোলে বন্ধু ভাসি চলে
হাসি' হাসি' নাচি' নাচি'।
যেমন ব্রহ্মার সনে ব্রহ্মাণী
তেমন ধ্যানস্তিমিত ঘাটে বসি' দু'টি
বিশ্বের জনকজননী।
যেমন কুমুদ-কান্ত কাঁতি,
পরশ পাইয়া চাহে দীননাথ
কোটি বিভাকর ভাতি।
যেমন নদী মিশে যায় সায়রে,
তেমন অন্তরের আলো বাহিরে মিলিল
অপরূপ শিশু নেহারে।
যেমন প্রোজ্জ্বল মণির মতি,
'এই ন্যাও' বলি অঙ্কে দিল তুলি'
চাহে বামাদেবী সতী।
যেমন নয়ন পাইল অন্ধ,
তেমন উল্লাস বাড়িল হৃদয়ে চাপিল,
চুমিল বচন চন্দ।
যেমন কৃপণ পাইলে ধন,
তেমন অঞ্চলে ঝাপিয়া চলে সঙ্গোপনে,
গৃহপানে দুইজন।
যেমন শ্রাবণে বরষা হয়,
তেমন পারিজাতরাশি দেবলোক বাসী,
বরষিল গ্রামময়।
আজি বিশ্বের শুভদিন,
মূঢ় মহানাম ব্রত পতিত বঞ্চিত
যেমন চাঁদে না জানিল মীন।

—০—

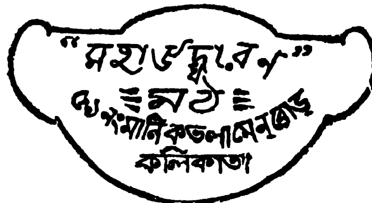
শুভ আবির্ভাব স্মরণে।

জ গদ্বন্ধু জন্মলীলা গোপ নে ভুলোকে।
গ ঙ্গা দেবী গরগর আ দ র পুলকে ॥
তে ই মুর্শীধাভাধরাঝ্ র সে র আলয়।
র ত্নপ্রসূ গঙ্গা অঙ্কে এ বা র উদয় ॥
না চিছে পরমা নন্দে স ক ল দেবতা।
থ রে থরে পুষ্প বৃষ্টি ক রে বেদ মাতা ॥
তু ঙ্গে পঞ্চ গ্রহ নাচে কি আ নন্দ হ'ল।
মি লি' চন্দ্র সূর্য্য আজ্ য শ প্রতিষ্ঠিল ॥
ত খন মহেন্দ্রক্ষণে প্র দী প পঞ্চকে।
ব রিল বৈশাখী শুক্লা শ্রী ন বমী তাকে ॥
নি শি অবসানে দিবা অ গোচর কালে ॥
জ নম লইল হরি পা পী ভাগ্যভালে ॥
দা মিনী দমকে দমি' সু ব রণ কায়।
স কল আঁধার হরে ব ন্ধু চন্দ্রমায় ॥
আ নন্দে দীনু-বামা স দা চুম খায়।
মি লেছে বাৎসল্যরসে র স সর্ব্বাশ্রয় ॥

নিয়মাবলী।

১। 'আঙ্গিনা' 'মহাধর্ম্ম মহাউদ্ধারণ' গ্রন্থ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীনিতাইগৌর ও শ্রীশ্রীহরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মাধুর্য্যময় লীলানুস্মরণই এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য।

২। বৎসরে চারি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। বৈশাখী সীতানবমী হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৶০ মাত্র। প্রতিসংখ্যা নগদ ।০ চারি আনা মাত্র। প্রবন্ধাদি 'কার্য্যালয়ে' প্রকাশকের নিকট প্রেরিতব্য।



বিনয়াবনত—
গোপীবন্ধু দাস।
প্রকাশক।

আঙ্গিনা কার্য্যালয়ঃ—

প্রিণ্টার—শ্রীললিতমোহন রায়
ললিত প্রেস—১১৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা॥